ফারাসত আলি পথচারী স্কুলের আরও অনেক গল্প করেছেন, বিজ্ঞান পরীক্ষা নিয়ে সমস্যার গল্প, ছায়া নিয়ে ভূতের ভয় পাওয়ার গল্প, হাতুড়ে ইঞ্জিনিয়ারদের পানির ট্যাংকের গল্প, মহসিনের কম্পিউটারের পাগলামির গল্প আরও কত কী! সবগুলি এখানে লেখা হল না, তা হলে একটা বিশাল উপন্যাস হয়ে যাবে, আজকাল মানুষের বিশাল উপন্যাস পড়ার সময় কোথায়? তা ছাড়া মনে হয় তার সবগুলি মানুষ বিশ্বাসও করবে না, মনে করবে আমি বুঝি বানিয়ে বানিয়ে বলছি।

ফারাসত আলি যাবার আগে আমাকে তাঁর স্কুলে নেমন্তন্ন করে গেছেন। ভাবছি একবার যেয়ে সবকিছু দেখে আসি।

এরকম একটা স্কুল নিজের চোখে না দেখলে কেমন করে হয়?

রাজু ও আগুনালির ভূত

১. প্রথম দিন

দুপুরবেলার দিকে রাজুর মনে একটা গভীর ভাবের জন্ম হল। রাজুর বয়স তেরো এবং এই বয়সেই তার মনে নানারকম গভীর ভাবের জন্ম হয়। তখন সে দুই হাত মাথার পিছনে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই গভীর ভাব নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। এরকম সময়ে তার মুখের দিকে তাকালে মনে হয় তার পেট ব্যথা করছে, কারণ কোনো-একটা কারণে তার দুই চোখ কুঁচকে যায় এবং মুখে কেমন জানি একটা যন্ত্রণার ভাব চলে আসে।

রাজুর মনে যখন গভীর ভাবের জন্ম হয় তখন যারা রাজুকে ভালো করে চেনে তারা তাকে ঘাঁটায় না। ঘাঁটিয়ে অবিশ্যি লাভও হয় না। কারণ, সে তখন কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তবে সাগরের কথা আলাদা, সে রাজুর ছোট ভাই, তার বয়স মাত্র সাত, কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তার ধৈর্য প্রায় একশো বছরের মুনিঋষিদের মতো। রাজু কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিলেও সে ধৈর্য ধরে প্রশ্ন করে যেতে থাকে এবং প্রায় সবসময়েই সাগর রাজুকে তার গভীর ভাবের জগৎ থেকে টেনে নিচে নামিয়ে আনতে পারে। রাজু তার জীবনের যে-তিনটি জিনিসকে সত্যি সত্যি অপছন্দ করে তার একটি হচ্ছে সাগর, অন্য দুটি হচ্ছে ট্যাঁড়শ ভর্তা এবং মাকড়শা। ট্যাঁড়শ ভর্তা এখনও কেউ তাকে খাওয়াতে পারেনি, মাকড়শা দেখামাত্র সে ঝাঁটা দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে, কিন্তু সাগরকে নিয়ে সে এখনও কিছু করতে পারেনি। রাজু মোটামুটি নিশ্চিত তার বয়স আঠারো বৎসর হওয়ার আগেই সে কোনো একদিন সাগরকে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলবে। রাগের মাথায় খুন করলে নাকি ফাঁসি হয় না, কাজেই তারও মনে হয় ফাঁসি হবে না, বড়জোর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যাবে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলে নাকি চোদ্দ বছর পর জেল থেকে বের হয়ে আসা যায়, তখন তার বয়স হবে সাতাশ, কাজেই তার পরেও মোটামুটি কিছু-একটা করে বেঁচে থাকা যাবে।

আজ দুপুরবেলাতেও সাগর না জেনেশুনে তার জীবনের উপর একটা বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলল। রাজু তখন দুই হাত মাথার নিচে দিয়ে আকাশের একটা চিলের দিকে তাকিয়ে ছিল। চিলটির দিকে তাকিয়ে থাকলেও সে এখন চিলটাকে আর দেখছে না, কারণ, তার মাথায় এখন খুব একটা জটিল চিন্তা খেলা করছে। ঠিক এই সময় সাগর রাজুর কাছে এসে বলল, "ভাইয়া, এই দেখো কী হয়েছে।"

রাজু তার কথা শুনল না। শুনলেও তার মুখ দেখে সেটা বোঝা গেল না। সাগর তখন রাজুর কাঁধ-কাঁকুনি দিয়ে বলল, "এই দেখো ভাইয়া।"

রাজু তখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল, শুধু তার মুখের যন্ত্রণার ভাবটা আরেকটু গাঢ় হয়ে উঠল। সাগর অবিশ্যি তাতে নিরুৎসাহিত হল না, তার ডান হাতটা রাজুর নাকের সামনে ধরে বলল, "চকলেটটা মুঠো করে ধরে রেখেছিলাম, দেখো কী হয়েছে!"

রাজুকে দেখতে হল। চকলেট মুঠো করে রাখলে চকলেট গলে যায়—অনেক্ষণ মুঠো করে রাখলে সেই গলে-যাওয়া চকলেট আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে বের হয়ে একটা জঘন্য ব্যাপার হয়— কনুই পর্যন্ত সারা হাত আঠালো চটচটে হয়ে যায় এবং মাছিরা কোনো কারণে সেটা খেতে খুব পছন্দ করে। সাগরকে ঘিরে কিছু মাছি ভ্যান ভ্যান করছিল এবং সেটা নিয়ে সাগরের কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হল না। সে তার চটচটে হাত জিব বের করে একবার চেটে বলল, "চেটে খেলে মনে হয় আইসক্রিম। তুমি খাবে?"

রাজু অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, "না, খাব না। ভাগ এখান থেকে।"

সাগর তবু নিরুৎসাহিত হল না, হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "একবার চেটে দেখো কেমন মিষ্টি মিষ্টি আবার নোনতা নোনতা লাগে।"

"নোনতা লাগে তোর হাতের ময়লার জন্যে। গাধা!"

সাগর মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি গাধা।"

"দেব একটা থাপ্পড়। ভাগ এখান থেকে।"

বয়সে বড়দের মান-সম্মান রেখে কথা বলাটা সাগর এখানও শেখেনি, মনে হয় তার শেখার কোনো ইচ্ছাও নেই। চকলেট-মাখা হাতটা উপরে তুলে বলল, "আমি দেব একটা থাপ্পড়।"

রাজু চোখ লাল করে বলল, "দিয়ে দেখ আমি তোর অবস্থা কী করি।"

রাজু কী করে সেটা দেখার জন্যেই মনে হয় সাগর একটা থাবড়া বসিয়ে দিচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে থেমে গিয়ে চকলেট-মাখা হাতটা মুখে পুরে একবার চেটে নিয়ে বলল, "তুমি পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে খারাপ ছেলে।"

রাজু কোনো কথা না বলে সাগরের দিকে চোখ লাল করে তাকাল, মানুষের চোখ দিয়ে যদি আগুন বের হওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকত তা হলে সাগর পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

সাগর অবিশ্যি রাজুর ভয়ানক দৃষ্টিকে এতটুকু গ্রাহ্য কলল না, আঙুল চাটতে চাটতে বলল, "তুমি দেখতে পর্যন্ত খারাপ। তুমি যখন রাগ হও তোমাকে দেখতে আরও খারাপ লাগে। থুঃ থুঃ থুঃ!"

রাজু রেগেমেগে বলল, "ভাগ এখান থেকে। জানে মেরে ফেলব।"

"এই দেখো তোমাকে দেখতে কত খারাপ লাগছে, থু!" বলে সাগর ঘরের মেঝেতে সত্যি সত্যি একদলা থুতু ফেলে দিল।

রাজু আরেকটু হলে সাগরকে মার দেওয়ার জন্যে প্রায় ধরে ফেলছিল, কিন্তু হঠাৎ তার একটা কথা শুনে সে থমকে দাঁড়াল। সাগর বলল, "আব্বু-আম্মু যখন ঝগড়া করে তখন তাদের দেখতে যত খারাপ লাগে তোমাকে তার থেকে বেশি খারাপ লাগে।"

রাজু কয়েক মুহূর্ত সাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অবাক হয়ে বলল, "কী বললি?"

সাগরের মুখটা হঠাৎ কেমন জানি কাঁদো-কাঁদো হয়ে যায়। কিছুক্ষণ মেঝেতে ফেলা তার থুতুর দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ পা দিয়ে সেটা মেঝেতে লেপটে ফেলে বলল, "কিছু না।"

রাজু গলার স্বর একটু নরম করে বলল, "কী বললি?"

সাগর এবার রাজুর দিকে তাকাল। সত্যি সত্যি গলার স্বর নরম করেছে না কি তাকে টিটকারি করছে বোঝার চেষ্টা করে বলল, "আব্বু আর আম্মুর যদি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তা হলে কী হবে?"

রাজু হেসে ফেলল, বলল, "ধুর গাধা! ছাড়াছাড়ি কেন হবে?"

সাগর আশান্বিত হয়ে বলল, "ছাড়াছাড়ি হবে না?"

"না।"

"তা হলে এত ঝগড়া করে কেন?"

"পৃথিবীর সব আব্বা-আম্মা ঝগড়াঝাঁটি করে।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

সাগর হঠাৎ করে খুব খুশি হয়ে ওঠে। রাজু তাকে যত বড় গাধা ভেবে এসেছে সে মনে হয় তত বড় গাধা না। আব্বা-আম্মার ঝগড়াঝাঁটিটা যদিও তাদের সামনে করা হয় না, তবুও সে ঠিকই টের পেয়েছে।

সাগর চলে যাবার পর রাজু আবার তার মাথার নিচে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল, এতক্ষণ সে যে-চিলের দিকে তাকিয়ে ছিল সেই চিলটা আর নেই। আকাশে এখন ছোট এক টুকরো সাদা মেঘ। সেই মেঘটা দেখতে একটা জাহাজের মতো। সেই জাহাজটা আবার আস্তে আস্তে একটা প্রাণীর মতো হয়ে যাচ্ছে— সেই প্রাণীটার বড় মাথা এবং লম্বা লেজ গজাতে গজাতে হঠাৎ সেটা কয়েকটা টুকরো হয়ে ভেসে গেল। টুকরো টুকরো মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাজু আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়—তার দুই চোখ কুঁচকে আসে, মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাকে দেখে মনে হতে থাকে আবার বুঝি তার পেটব্যথা করছে।

তার অবিশ্যি পেটব্যথা করছিল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে হঠাৎ কেমন জানি ভয় ঢুকে গেছে। সাগরকে সে অবিশ্যি অনেক জোর গলায় বলেছে তার আব্বা-আম্মার কখনও ছাড়াছাড়ি হবে না, কিন্তু সত্যি যদি হয়ে যায় তখন কী হবে? রাজুর হঠাৎ কেমন জানি গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, ব্যাপারটা সে চিন্তাও করতে পারে না।

রাজুর আব্বার নাম আজিজুল হক—সবাই অবিশ্যি তাঁকে ডক্টর আজিজ বলে ডাকে। আব্বা অবিশ্যি সত্যিকারের রোগী দেখার ডাক্তার না, অঙ্কে পিএইচ. ডি. করেছেন। মানুষ যখন পিএইচ. ডি. করে তখন তাকে ডক্টর বলে কেন কে জানে, অন্য একটা-কিছু বললেই হয়! মনে হয় সবাইকে একটা ধোঁকার মাঝে ফেলে দেওয়ার একটা বুদ্ধি ছাড়া ব্যাপারটা আর কিছুই না। আব্বা যখন মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়িতে যান তখন গ্রামের যত মানুষের রোগ-শোক আছে তারা আব্বার কাছে চিকিৎসার জন্যে চলে আসে। আব্বা যতই তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে তিনি চিকিৎসা করার ডাক্তার না, তারা কিছুতেই সেটা বিশ্বাস করে না। রাজু আরও একটা ব্যাপার ভালো করে বুঝতে পারে না, সেটা হচ্ছে, মানুষ অঙ্কে কেমন করে পিএইচ. ডি. করে। তখন কি এক মাইল লম্বা একটা সরল অঙ্ক করতে দেওয়া হয়, আর একজন সেটা টুক টুক করে শেষ করে, নাকি অন্যকিছু? রাজু আর আব্বাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে, আব্বা শুনে হেসেই বাঁচেন না—শেষে বলেছেন, রাজু বড় হলে নাকি বুঝতে পারবে। রাজুর আব্বা ইউনিভার্সিটিতে অঙ্ক পড়ান, তাঁকে দেখতেও ঠিক অঙ্কের প্রফেসরের মতো দেখায়—চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, জুলফির কাছে চুলে পাক ধরেছে। মুখে একটা গম্ভীর ভাব, কিন্তু চোখ দুটি সবসময়েই কোমল যেন হাসিহাসি,

একজন মানুষের চোখ হাসিহাসি হয়ে মুখ কেমন করে গম্ভীর হতে পারে রাজু কখনও বুঝতে পারে না।

রাজুর আম্মার নাম ফারহানা হক, শুধু আম্মার অফিসের কেউ-কেউ তাঁকে ডাকে মিসেস ফারহানা হক। অন্য সবাই তাঁকে ডাকে ঝর্না। রাজুর আব্বাও তাকে ডাকেন ঝর্না—সাগর যখন ছোট ছিল সেও ডাকত ঝর্না। রাজুর আম্মা দেখতে একেবারে অসাধারণ— তাঁকে দেখায় কলেজের একটা মেয়ের মতো, তাঁকে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না যে তাঁর তেরো বছরের এত বড় একটা ছেলে আছে। আম্মার যখন অফিসে যান তখন রাস্তাঘাটের সব মানুষ চোখ ট্যারা করে আম্মার দিকে তাকিয়ে থাকে। যারা দেখতে বাড়াবাড়ি সুন্দরী হয় তাদের মেজাজ মনে হয় একটু বেশি গরম হয়— আম্মার মেজাজও বেশ গরম। রাজু কিংবা সাগর যখন ঢ্যাঁড়শ ভর্তা কিংবা করলা ভাজা খেতে না চায় তখন আম্মা এত রেগে যান যে সেটা বলার মতো না। আব্বা মাঝে মাঝে বলেন, "থাক থাক, একদিন না খেলে কিছু হবে না"— আম্মা তখন আরও রেগে গিয়ে বলেন, "তুমি লাই দিয়ে দিয়ে ছেলেগুলির মাথা নষ্ট করেছ। মানুষজন শুধু কাঁচামরিচ আর লবণ দিয়ে ভাত খেয়ে বেঁচে আছে তুমি সেটা জান? এই দেশের কত পার্সেন্ট মানুষ ব্যালেন্সড্ ডায়েট খায় খবর আছে কারও?"

আম্মা গরিব-দুখি মেয়েদের একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। যেসব মেয়ের স্বামীরা তাদের বউদের ছেড়ে চলে যায়, কিংবা বাড়ি থেকে বের করে দেয়, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কোথাও যাবার জায়গা থাকে না, তারা এখানে এসে থাকে। গরিব-দুখি মেয়েদের দেখে দেখে আম্মা নানারকম হিসেব শিখে গেছেন। শতকরা কতজন মানুষ বউদের পেটায়, কতজন মানুষ বউদের ছেড়ে চলে যায়, কতজন যৌতুকের টাকা দেয়নি বলে বউদের মেরে ফেলে—সব হিসেব আম্মার ঠোঁটের ডগায়। দরকার হলেই আম্মা এখন সেসব হিসেব আব্বার উপর, নাহয় তাদের উপর ঝাড়তে থাকেন। রাজুর মাঝে মাঝে মনে হয়, আম্মা যদি গরিব-দুখি মানুষজনের জন্যে কাজ না করে বড়লোকদের বাচ্চাদের কোনো স্কুলে কাজ করতেন তা হলে মন্দ হত না। আম্মা তা হলে জানতেন বড়লোকের বাচ্চাদের কত মজার মজার খেলনা থাকে, তারা কত ভালো ভালো জিনিস খায়, ছুটিছাটায় কত দেশ-বিদেশ ঘোরে, গাড়ি করে কত সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়াতে যায়—সে-তুলনায় তারা তো কিছুই করে না, কে জানে তা হলে হয়তো আম্মা এত বকাবকিও করতেন না।

আব্বা আর আম্মার মাঝে সমস্যা যে, দুজনেই খুব তেজি মানুষ—কখনও কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। হয়তো খবরের কাগজে উঠেছে—একজন মানুষ বাড়ি এসে দেখেছে বউ ভাত রান্না করেনি, সে রেগে এত জোরে বউকে মেরেছে যে, বউ মরেই গেছে—প্রায় প্রত্যেকদিনই এরকম খবর দু-চারটা থাকে, আর এরকম খবর আম্মার চোখে পড়লে কোনো রক্ষা নেই—সমস্ত পুরুষজাতির চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে ছেড়ে দেন। আব্বা তখন নিরীহ পুরুষদের পক্ষে একটা-দুটো কথা বলেন আর সঙ্গে সঙ্গে আম্মার সাথে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। একবার একটা ঝগড়া শুরু হয়ে গেলে সেটা কোনদিকে মোড় নেবে বলা খুব মুশকিল। মাঝে মাঝে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হয়ে থেমে যায়। মাঝে মাঝে সেটা অনেক দূর এগোয়, ঝগড়ার ডালপালা গজায়, কবে আব্বা আম্মাকে কী বলেছিলেন বা আম্মা আব্বাকে কী করেছিলেন সেইসব বৃত্তান্ত চলে আসে। রাজু কিংবা সাগরের সামনে দুজনেই অবিশ্যি খুব সামলে-সুমলে থাকার চেষ্টা করেন, কিন্তু সবসময় যে সেটা সম্ভব হয় সেটা সত্যি নয়— একবার তো আম্মা আব্বার দিকে একটা গ্লাস ছুড়ে মারলেন, গ্লাস ভেঙে পানি

পড়ে একটা একাকার অবস্থা। ঝগড়াগুলি অবিশ্যি খুব বেশি দিন টিকে থাকে না—এক-দুইদিন পর, কোনো কোনোদিন এক-দুই ঘন্টা পর মিটমাট হয়ে যায়। তখন আবার আম্মা আর আব্বা খুব হাসিখুশি থাকেন, তাঁদের দেখে বোঝাই যায় না যে তাঁরা ঝগড়া করতে পারেন।

যেমন ধরা যাক আজকের ব্যাপারটা। ছুটির দিন সবাই মিলে বাসায় থেকে হৈ-চৈ করার কথা, ভালোমন্দ কিছু-একটা কান্না করার কথা, বিকালবেলা কোথাও বেড়াতে যাবার কথা— কিন্তু সেসব কিছুই হল না। সকালবেলাতেই আম্মা আর আব্বার মাঝে ঝগড়া লেগে গেল, ঝগড়ার বিষয়বস্তুটা কী সেটা রাজু ঠিক ধরতেও পারল না—আব্বা আম্মা দুজনেই একজন আরেকজনকে খুব খারাপ খারাপ কথা বলতে লাগলেন, আব্বা তখন রেগেমেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আম্মা খানিকক্ষণ একা একা দাপাদাপি করলেন, তারপর আম্মাও ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন, যাবার আগে বলে গেলেন আর কখনও ফিরে আসবেন না। সেটা নিয়ে অবিশ্যি রাজু খুব মাথা ঘামাল না, আম্মা প্রত্যেকবারই ঘর থেকে যাবার আগে বলে যান আর কখনও ফিরে আসবেন না। আম্মা গেলে সাগরের মনে হয় একটু সুবিধেই হয়। ফ্রিজের মাঝে তুলে রাখা চকলেটগুলি বের করে খেতে শুরু করে।

বিকেলবেলা প্রথমে আব্বা ফিরে এলেন, তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কে জানে বাসার বাইরে গিয়ে আব্বা আর আম্মা ঝগড়াঝাঁটির বাকি অংশটা শেষ করে এসেছেন কি না! ঝগড়াঝাঁটি মনে হয় খুব পরিশ্রমের ব্যাপার, প্রত্যেকবার একটা বড় ঝগড়া করার পর আব্বা আর আম্মা দুজনকেই দেখে মনে হয় খুব বুঝি পরিশ্রম হয়েছে।

আব্বার চুলিগুলি উশকো খুশকো, মুখ শুকনো। বাসায় এসে সোফায় হাঁটুর উপর হাত রেখে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। রাজু কয়েকবার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল, মনে হয় তাকে দেখতেই পেলেন না। একসময় আব্বা উঠে গিয়ে ক্যাসেট-প্লেয়ারে একটা গান লাগিয়ে সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। রাজু গানটান শোনে না, শুনতে ভালও লাগে না। বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীত তার দুচোখের বিষ, আর আব্বা বাসায় এসেই রবীন্দ্র-সংগীতের একটা ক্যাসেট লাগিয়ে বসে থাকেন। রাজু পাশের ঘরে বসে বসে রবীন্দ্র-সংগীত শুনতে লাগল— টেনে টেনে গাইছে শুনলেই কেমন জানি মন-খারাপ হয়ে যায়।

ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে রাজু নিজের ঘরে ফিরে এল। তার ঘরটা অবিশ্যি তার একার নয়—তার এবং সাগরের। ঘরটা ছোট, দুইপাশে দুটা ছোট ছোট বিছানা, মাঝখানে পড়াশোনা করার জন্য ছোট একটা টেবিল।

একপাশে একটা শেলফ— সেখানে গাদা করে রাখা অনেরকম গল্পের বই। একটা বিছানায় সাগর ঘুমিয়ে আছে, অসময়ের ঘুম, বিছানায় অর্ধেক শরীর বাকি অর্ধেক মেঝেতে। একজন মানুষ যে এভাবে ঘুমাতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। রাজু খানিকক্ষণ চিন্তা করল শরীরের নিচের অংশ উপরে তুলে দেবে, নাকি উপরের অংশ নিচে নামিয়ে দেবে। অনেক ভেবেচিন্তে সে কোনোটাই করল না। হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে যায় তা হলে সাগর হয়তো চিৎকার করেই বাসা মাথায় তুলে ফেলে বলবে, সে এইভাবেই ঘুমাতে চায়, কেন তাকে ঠিক করা হল! সাগরকে নিয়ে যা মুশকিল সেটা আর বলার মতো নয়।

রাজু তার চেয়ারে বসে মাথার নিচে হাত দিয়ে আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। আবার তাকে দেখে মনে হতে লাগল তার পেটব্যথা করছে।

আম্মা এলেন ঠিক সন্ধেবেলায়। ততক্ষণে সাগর ঘুম থেকে উঠে গেছে। অসময়ে ঘুমিয়েছিল, তাই ঘুম থেকে উঠে সাগর খুব মেজাজ করতে লাগল। প্রথমে খানিকক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদল, তারপর এক গ্লাস পানি উলটে ফেলে দুটো বই মেঝেতে ছুড়ে দিল। সবার শেষে একটা খেলনা লাথি মেরে ছুড়ে দিল দূরে, তারপর সোফায় মুখ ভোঁতা করে বসে রইল। অন্যদিন হলে আম্মা আচ্ছা করে বকে দিতেন, আজকে সারাদিন বাসায় ছিলেন না বলে নিশ্চয়ই আম্মারও খুব খারাপ লেগেছে, তাই সাগরকে কিছু বললেন না। শুধু তাই না, আম্মা ক্যাসেটে একটা গান লাগিয়ে দিয়ে সাগরকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ সোফায় বসে রইলেন। টেনে টেনে গাওয়া গান, এটা শুনলেও মন-খারাপ হয়ে যায়, নিশ্চয়ই এটাও রবীন্দ্রসংগীত হবে। রবীন্দ্রনাথ কেন যে এতগুলি দুঃখের গান লিখেছেন কে জানে! গান শুনেই কি না কে জানে সাগর আম্মাকে ধরে ফোঁপাতে লাগল, আর আম্মাও খুব মন-খারাপ করে বসে রইলেন।

রাত্রিবেলা খাবার টেবিলে আব্বা খেতে এলেন না, সাগর কয়েকবার তাঁর হাত ধরে টানাটানি করে বলল, "খেতে আসো আব্বু, খেতে আসো!"

আব্বা নরম গলায় বললেন, "তোরা খা, আমার খিদে নেই।"

"রাত্রিবেলা খেতে হয়। মনে নেই তুমি বলেছিলে না খেলে চড় ই পাখির সমান রক্ত কমে যায়?"

আব্বা হেসে বললেন, "আমার গায়ে অনেক রক্ত, দুই-চারটা চড় ই পাখির রক্ত কমে গেলে কিছু হবে না। তোরা খা।"

রাজু বুঝতে পারল আসলে আব্বা আর আম্মার ঝগড়া এখনও মেটেনি, দুজনে তাই একসাথে বসতে চাইছেন না। সাগর অবিশ্যি বেশি বোঝাবুঝির মাঝে গেল না, খাবার টেবিলে বসে আম্মার সাথে তর্ক করতে লাগল, "আম্মা, আব্বু ভাত খাবে না কেন?"

"খিদে নেই মনে হয়।"

"আমার যখন খিদে থাকে না তখনও তো তুমি আমাকে জোর করে খাওয়াও। খাওয়াও না?"

আম্মা উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্কের মতো বললেন, "ও!"

"কথা বল না কেন আম্মা?"

আম্মা সাগরের দিকে তাকিয়ে দুর্বলভাবে হেসে বললেন, "এই তো কথা বলছি!"

"আব্বাকে ডাকো খাওয়ার জন্যে।"

"খেতে না চাইলে কি জোর করে খাওয়ানো যায়?"

"আমাকে তো জোর করে খাওয়াও। মনে নেই সেদিন ছোট মাছে কত কাঁটা ছিল, আমার খাওয়ার ইচ্ছা করেনি তবু তুমি বললে খেতে হবে?"

আম্মা সাগরের মাথায় হাত বুলিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে বাবা, আর বলব না।"

সত্যি সত্যি খাবার টেবিলে আম্মা কিছু বললেন না। রাজু ইচ্ছে করে যখন বাঁধাকপির ভাজাটা নিল না আম্মা সবজির উপকারিতা নিয়ে কোনো বক্তৃতা দিলেন না। ছোট মাছটা একটু খেয়ে ফেলে দেবার পরেও খাবারের অপচয় যে কত খারাপ এবং পৃথিবীতে তার বয়সী কত শিশু যে না খেয়ে আছে সেই কথাগুলি মনে করিয়ে দিলেন না। মজার ব্যাপার হল, রাজুর মনে হতে লাগল সবজির উপকারিতা কিংবা খাবারের অপচয়ের ওপরে আম্মার

উঁচু গলার বক্তৃতাটাই আসলে চমৎকার ব্যাপার। আম্মার বকুনি না খেয়ে এই প্রথমবার রাজুর মন-খারাপ হয়ে গেল।

রাজু আর সাগরের পরীক্ষা শেষ, পড়াশোনার ঝামেলা নেই। পরীক্ষা চলার সময় মনে হয় পরীক্ষা শেষ হলে কত কী করবে, কিন্তু সত্যি যখন পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় তখন হঠাৎ করে দেখা যায় কিছুই করার নেই। বিশেষ করে আজকের দিনটা বাড়াবাড়ি খারাপ, রাজু বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা গল্পবই পড়বে নাকি টেলিভিশন খুলে কী হচ্ছে দেখবে ঠিক করতে পারছিল না, ঠিক তখন দরজায় শব্দ হল— কেউ-একজন এসেছে। রাজু দরজা খুলেই দেখে বাইরে আজগর মামা দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ করে রাজুর মনে হল নিশ্চয়ই খোদা বলে কেউ আছেন, শুধু তাই না, সেই খোদা নিশ্চয়ই ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে পছন্দ করেন, যখন দেখেন তারা খুব কষ্ট পাচ্ছে তখন একজন-দুইজন ফেরেশতাকে মানুষের মতো রূপ দিয়ে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তা না হলে আজকের দিনে এই সময়ে আজগর মামা কেমন করে এলেন! সারা পৃথিবীতে একটিমাত্র মানুষই আছে যে অসম্ভব খারাপ, দুঃখের, কষ্টের, যন্ত্রণার একটা সময়কে পুরোপুরি পালটে দিয়ে সেটাকে আনন্দের, মজার, হাসি-তামাশা, ফুর্তির একটা সময় তৈরি করে ফেলতে পারেন, আর সেই মানুষটি হচ্ছেন আজগর মামা। কী আশ্চর্য—সেই আজগর মামা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন!

আজগর মামা নিচু গলায় বলতে পারেন না—তাই দরজায় দাঁড়িয়ে একটা হাঁক দিলেন, "কী হল, ভিতরে ঢুকতে দিবি, নাকি দাঁড়িয়ে থাকবি?"

রাজু উত্তর না দিয়ে চিৎকার করে এক লাফে আজগর মামার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তেরো বছরের একজন সাধারণত কারও উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না, আজগর মামা সতর্ক ছিলেন বলে কোনোমতে সামলে নিয়ে আরেকটা হাঁক দিলেন, "আরে ছাগল, ঘাড়ে উঠে পড়বি নাকি? ছাড় বলছি—ছাড়!"

রাজু আজগর মামাকে ছাড়ল না। এবং রাজুর চিৎকার শুনে সাগর ছুটে এসে সেও লাফিয়ে আজগর মামার ঘাড়ে ঝুলে পড়ল। আজগর মামা সেই অবস্থাতে দুজনকে ঝুলিয়ে নিয়ে কোনোমতে ঘরে ঢুকে দুই পাক খেয়ে তাদের সোফায় ছুড়ে দিলেন। সাগর চিৎকার করে ঘরে দৌড়াতে লাগল, "অজগর মামা এসেছে, অজগর মামা অজগর মামা—"

আজগর মামা ঘরের বাইরে থেকে তাঁর জিনিসপত্র আনতে যাচ্ছিলেন, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা হুঙ্কার দিলেন, "অজগর বলবি তো মাথা ভেঙে ফেলব পাজি ছেলে—"

ধমক খেয়ে সাগরের আরও আনন্দ হল, সে দুই হাত দুইদিকে প্লেনের মতো ছড়িয়ে দিয়ে "অজগর অজগর" করে চিৎকার করে ঘরে দৌড়াতে লাগল।

চিৎকার হৈচৈ শুনে আব্বা-আম্মা বের হয়ে এলেন এবং প্রথমবার তাঁদের দুজনের মুখে হাসি ফুটে উঠল, শুধু তা-ই না, তাঁরা দুজন একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। সারাদিন যে ঝগড়া করে মুখ গোমড়া করে বসে ছিলেন সেটা হঠাৎ করে তাঁরা কেমন করে যেন ভুলে গেলেন।

আব্বা এগিয়ে গিয়ে বললেন, "আরে আজগর ভাই! আপনি কোথা থেকে?"

আম্মা বললেন, "দাদা, তুমি হঠাৎ করে?"

আজগর মামা তাঁর ঝোলাঝুলি নিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "হঠাৎ করেই তো আসতে হয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আসব নাকি?"

মামার হাতে একটা পাখির খাঁচা-সেখানে অনেকগুলি পাখি, হঠাৎ ঘরে আলোর মাঝে এসে কিচিরমিচির করতে শুরু করল। রাজু অবাক হয়ে বলল, "মামা, পাখি এনেছ? পাখি?"

"হ্যাঁ, স্টেশনে দেখলাম বিক্রি করছে, কিনে আনলাম।"

আব্বা ভালো করে দেখে বললেন, "এ তো চড় ই পাখি!"

"হ্যাঁ, যে বিক্রি করছিল সে বলে বাইগুড়ি। খুব ভালো নাকি খেতে।"

আম্মা বললেন, "এই চড় ই পাখি তুমি খাবে?"

"ধুর! আজগর মামা হাত নেড়ে বললেন, এইটুকুন পাখিকে লোকজন জবাই করে করে খাবে শুনেই খারাপ লাগল। তাই কিনে এনেছি—সবগুলিকে ছেড়ে দেব।"

সাগর হাততালি দিয়ে বলল, "আমি ছাড়ব মামা আমি ছাড়ব!"

আজগর মামা বললেন, "সবাই মিলে ছাড়ব কী মজা হবে না?"

সাগর মাথা নাড়ল, রাজু মাথা নাড়ল, এমনকি আব্বা আর আম্মাও মাথা নাড়লেন। মামা পাখির খাঁচটা টেবিলের উপর রাখলেন, আম্মা বললেন, "টেবিলে রেখো না, নোংরা করে দেবে!"

আজগর মামা আম্মার কথাকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "করুক। চড় ই পাখি কি আর মানুষ নাকি? কতই আর নোংরা করবে।"

বসার ঘর লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে আজগর মামা তাঁর পোঁটলা-পুঁটলি খুলতে লাগলেন। মাটির হাঁড়িতে করে মোষের দুধের দই বের হল। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি গোখরো সাপ বের হল, হাতে ধরলেই সেটা কিলবিল করে নড়তে থাকে। বিচিত্র রঙের মাটির পুতুল বের হল, মানুষের মস্তিষ্ক নামের ছবিওয়ালা ইংরেজি বই বের হল, নলেন গুড়ের সন্দেশ বের হল, রংচঙে শার্ট বের হল, গানের ক্যাসেট বের হল, খেলনা-পিস্তল বের হল, পেন্সিল কাটার চাকু বের হল, ছোট একটা ঢোল বের হল এবং সবার শেষে অনেকগুলি বাংলা গল্প-কবিতার বই বের হল। কে কোনটা নেবে সেটা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হল। আজগর মামাও সেই কাড়াকাড়িতে যোগ দিলেন এবং দেখা গেল শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগে পড়েছে মাটির হাঁড়িতে করে আনা দুর্গন্ধযুক্ত মোষের দুধের দই। আব্বা পেয়েছেন রংচঙে শার্ট আর বই, আম্মা পেয়েছেন গানের ক্যাসেট আর সন্দেশ, বাকি সবকিছু রাজু আর সাগরের। তারা দুজনে কে কোনটা নেবে সেটা নিয়ে ঝগড়া বেধে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজগর মামা এলে সবাই এত ভালো হয়ে যায় যে কেউ আর ঝগড়াঝাঁটি করল না। রাজু নিজে থেকে সাগরকে কিলবিলে সাপটা দিল, সাগরও পেন্সিল কাটার চাকুটার জন্যে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে শুরু করল না।

আজগর মামার জন্যে আবার টেবিলে খাবার দেওয়া হল, এবারে আব্বাও খেতে বসলেন। আম্মা দুজনকে খাবার তুলে দিতে লাগলেন আর পুরো সময়টাতে রাজু আর সাগর আজগর মামার গায়ে লেপটে দাঁড়িয়ে রইল। আজগর মামার খাওয়া একটা দেখার মতো ব্যাপার, যেটাই তাঁকে খেতে দেওয়া হয় সেটাই এত মজা করে খান যে দেখে লোভ লেগে যায়। মোরগের হাড়কে চুষে চুষে বারোটা বাজিয়ে সেটাকে চিবিয়ে একেবারে তুষ করে ফেলে দেন। মাছের মাথা কড়মড় করে চিবিয়ে সেটাকে লজেন্সের মতো করে চুষতে থাকে, ডালমাখা ভাত মুখে পুরে চোখেমুখে এমন একটা ভাব নিয়ে আসেন যেন দেখে মনে হয় পৃথিবীতে এর থেকে ভালো কোনো খাবারই নেই। রাজুর ধারণা, আজগর মামাকে যদি একটা খবরের কাগজ খেতে দেওয়া হয়, মামা সেটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে দিয়ে এমনভাবে চিবাতে থাকবেন যে দেখে মনে হবে বুঝি রসগোল্লা খাচ্ছেন।

খাওয়ার পর পাখির খাঁচা নিয়ে সবাই মিলে ছাদে উঠে এল। ছাদটা নির্জন সুমসাম, আকাশে অর্ধেকটা চাঁদ, তাতেই খুব সুন্দর নরম একটা আলো। পাশে নারকেল গাছ বাতাসে ঝিরঝির করে নড়ছে, দেখে কী যে ভালো লাগছে বলার মতো নয়। মামা পাখির খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট চড় ই পাখি বের করে এনে বললেন, "যা ব্যাটা উড়ে যা—সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকিস!"

চড় ই পাখিটা যেন মামার কথাটা বুঝতে পারল—চিড়িক করে একটা শব্দ করে রাতের আকাশে উড়ে গেল। মামার কথা শুনে রাজু আর সাগর হি হি করে হাসতে থাকে। মামা ধমক দিয়ে বললেন, "হাসছিস কেন? একটু উপদেশ দিয়ে দেয়া ভালো না?"

সাগরও পাখির খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে একটা চড় ই পাখির বের করে এনে বলল, "যা পাখি উড়ে যা, মিলেমিশে থাকিস!"

তখন আম্মাও পাখির খাঁচার হাত ঢুকিয়ে একটা পাখি বের করে এনে বললেন, "যা পাখি উড়ে যা! পৃথিবীর যত মানুষ তাদের বউদের সাথে ঝগড়া করে সবার মাথায় পিচিক করে বাথরুম করে দিস!"

শুনে সবাই হি হি করে হেসে উঠল, আব্বা হাসলেন সবচেয়ে জোরে, তারপর আব্বাও একটা চড় ই পাখি বের করে এনে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "যা পাখি উড়ে যা! পৃথিবীর যত বদমেজাজি বউ আছে তাদের নাকের ডগায় ঠোকর দিয়ে আয়!"

তখন রাজু একটা পাখি বের করে উড়িয়ে দিয়ে বলল, "পৃথিবীর সব অঙ্কের মাস্টারের মাথায় বাথরুম করে দিস!"

তখন সাগর একটা পাখি বের করে উড়িয়ে দিয়ে বলল, "যা রে পাখি উড়ে যা, অজগর মামার মাথায় বাথরুম করে দিস!"

তখন আজগর মামা খুব রেগে যাবার ভান করে সাগরকে মাথায় উপরে তুলে নিলেন যেন আছাড় মেরে ফেলে দেবেন। আর তা-ই দেখে সবাই আবার হি হি করে হাসতে লাগল।

একটা একটা করে সবগুলি পাখিকে ছেড়ে দেওয়া হল। ছাড়ার আগে সবগুলি পাখিকেই কোনো-না-কোনো উপদেশ দিয়ে ছাড়া হল। কাউকে বলা হল বানান শিখতে, কাউকে বলা হল অঙ্ক করতে, কাউকে বলা হল ঘুমানোর আগে দাঁত ব্রাশ করতে। অনেকগুলি পাখি ছাড়া হল ভণ্ড পীর-ফকিরদের মাথায় বাথরুম করতে। আম্মা অনেকগুলি ছাড়লেন যারা তিন-চারটা করে বিয়ে করে তাদের মাথায় ঠোকর দিতে। সবচেয়ে বেশি পাখি ছাড়া হল রাজাকারদের চাঁদিতে বাথরুম করার জন্যে।

পাখিগুলি ছেড়ে দেবার পর সবাই ছাদের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চাঁদের নরম আলোতে কেন জানি কেউ জোরে কথা বলে না, আজগর মামা পর্যন্ত আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগলেন। খানিকক্ষণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে মামা আম্মার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঝর্না, তুই গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস নাকি?"

আম্মা বললেন, "মোটামুটি। এত কাজের ঝামেলা—"

"সে কী!" মামা বললেন, "ছাড়িস না খবরদার! এত সুন্দর গলা তোর! গা দেখি একটা গান।"

"যাও! এইভাবে গান গাওয়া যায় নাকি?"

"এইভাবেই গাওয়া যায়—এখন তোর জন্যে শামিয়ানা টাঙিয়ে ঢাক ঢোল আনব নাকি! এইভাবেই গা!"

অন্য কেউ বললে কী হত কে জানে, কিন্তু আজগর মামা কিছু বললে কেউ সেটা ফেলে দিতে পারেন না। আম্মা আব্বার গায়ে হেলান দিয়ে প্রথমে মৃদু স্বরে, তারপর আস্তে আস্তে গলা খুলে গান গেয়ে উঠলেন—আজি জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই গান—কিন্তু কী সুন্দর! রাজু অবাক হয়ে ভাবল আজ রাতে তারা যে সবাই এখানে এসেছে সেটা ঐ বুড়ো লোকটা জানল কেমন করে?

রাজু আর সাগর গিয়ে আজগর মামাকে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আম্মার গলার গান বাতাসে জাদুমন্ত্রের মতো ঘুরপাক খেতে লাগল, আকাশ থেকে জোছনা গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে পড়তে লাগল আর নারকেল গাছের পাতা বাতাসে তিড়তিড় করে নড়তে লাগল।

হঠাৎ করে রাজুর মনে হল, বেঁচে থাকা ব্যাপারটা কী সে মনে হয় বুঝতে পেরেছে।

২. দ্বিতীয় দিন

রাজুর ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। তাদের ঘরে দুটি বিছানা একত্র করে একটা বড় বিছানা তৈরি করে তার মাঝে সাগর, রাজু আর আজগর মামা ঘুমিয়েছিল। ঘুমুতে ঘুমুতে অনেক দেরি হয়েছিল, আজগর মামা এলে সবসময় তা-ই হয়, সব নিয়ম-কানুন ওলটপালট হয়ে যায়। সাগর এখনও ঘুমিয়ে আছে, রাজু উঠে পড়ল। বসার ঘর থেকে আব্বা, আম্মা আর আজগর মামার গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। চোখ মুছে সে বসার ঘরে উঁকি দিল—আজগর মামা সোফায় হেলান দিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছেন, হাতে গামলার মতো বড় একটা মগ, সেটা বোঝাই গরম চা। মামা রাজুকে দেখে একটা হাঁক দিলেন, "রাজু! রেডি হয়ে যা"

"কেন মামা?"

"যাবি আমার সাথে।"

"কোথায়?"

"আমার বাসায়। দেখবি কী ফাস্টক্লাস একটা মোটর-সাইকেল কিনেছি—ইয়ামাহা একশো সি. সি.! গুলির মতন যায়। রেডি হ।"

"সত্যি?" রাজু তার আম্মা-আব্বার দিকে তাকাল।

আজগর মামা একটা ধমক দিয়ে বললেন, "সত্যি না তো কী? পরীক্ষা শেষ, এখন ঘরে বসে বসে টেলিভিশন দেখে পচে যাবি নাকি? যা, সাগরকে ডেকে তোল—"

আম্মা বললেন, "দাদা, তোমার অসুবিধে হবে, ওরা খুব জ্বালাতন করে।"

"করলে করবে। আজগর মামা গোঁফের ফাঁক দিয়ে হেসে বলল, আমিও জ্বালাতন করব। সমান-সমান হয়ে যাবে।"

রাজু আনন্দে একটা চিৎকার দিয়ে গিয়ে সাগরকে ডেকে তুলল। অন্য দিন হলে সাগর উঠেই রেগেমেগে কিছু একটা বলে বসত। আজকে কিছুই করল না, মামার বাসায় যাবে শুনে সেও চিৎকার করে বিছানা থেকে নেমে দুই হাত প্লেনের মতো দুইদিকে ছড়িয়ে দিয়ে সারা ঘরে দৌড়াতে শুরু করে।

ট্রেন দশটার সময়, হাতে বেশি সময় নেই। তাড়াতাড়ি সবকিছু ঠিকঠাক করে নিতে হবে। বেশি জিনিস নিয়ে কোথাও যাওয়া মামা দুচোখে দেখতে পারেন না—আগেই ঘোষণা করে দিলেন যে যেটা নিজে টেনে নিতে পারবে সে সেটা নেবে। রাজু আর সাগর

তাদের স্কুল-ব্যাগ খালি করে সেখানে কয়েকটা জামাকাপড় কাগজ-কলম গল্পের বই ভরে নিল। সাগর তার কিলবিলে গোখরো সাপ আর খেলনা-পিস্তল নিয়ে নিল। রাজু নিল তার পেন্সিল কাটার চাকু। আম্মা টুথব্রাশ চিরুনি আর তোয়ালে বের করে দিলেন। সাথে পানির বোতল আর ছোট বিস্কুটের প্যাকেট। আব্বা মানিব্যাগ বের করে কিছু টাকা বের করে দিলেন—তার সাথে সেটা সাবধানে কীভাবে রাখতে হবে তার উপরে একটা বিশাল বক্তৃতা।

বের হবার আগে সকালের নাস্তা করে যেতে হবে, কিন্তু উত্তেজনায় রাজু আর সাগর কিছু খেতে পারছিল না। আম্মা বললেন, প্লেটের পুরো খাবার শেষ না করা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হতে পারবে না, তাতে ট্রেন ফেল করলে করবে।

এমনিতেই রোজ যা খেতে হয় আজকে তার থেকে দ্বিগুণ খেতে দিয়েছেন—শুধু তা-ই নয়, খাওয়ার পর পুরো এক গ্লাস দুধ—জীবনের উপরে বিতৃষ্ণা এসে যাবার মতো অবস্থা!

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি তারা ঘর থেকে বের হল, আম্মা-আব্বা হেঁটে হেঁটে একেবারে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। স্কুটারে ওঠার আগে আম্মা প্রথমে সাগরকে, তারপর রাজুকে একবার বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "সাবধানে থাকিস। মামাকে বেশি জ্বালাবি না।"

সাগর বলল, "আর মামা যদি জ্বালায়?"

আম্মা হেসে ফেললেন, বললেন, "তা হলে কী হবে তো জানি না।"

স্টেশনে পৌঁছানোর পর থেকে শুধু দৌড়। প্রথমে দৌড়ে দৌড়ে টিকেট কেনা, তারপর দৌড়ে দৌড়ে ট্রেনে ওঠা। ট্রেনে উঠে দেখা গেল সেটা ভুল ট্রেন, তারপর আবার দৌড়ে দৌড়ে ঠিক ট্রেনে ওঠা। ছুটে ছুটে রাজু আর সাগরের দম ফুরিয়ে গেল সত্যি, কিন্তু ভারি মজা হল। ট্রেনে ওঠার পর দেখা গেল এত ছোটাছুটি করে ট্রেনে ওঠার কোনো দরকার ছিল না, ট্রেন ছাড়তে বেশ দেরি আছে।

ট্রেনে ওঠার আগে মনে হয় ট্রেনটা যেন ছেড়ে না দেয়, ট্রেনে ওঠার পর মনে হয় এখনও ছাড়ছে না কেন ট্রেনটা! সাগর একটু পরে পরে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "ছাড়ছে না কেন ট্রেনটা?"

আজগর মামা একটা খবরের কাগজ কিনে নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে সেটা পড়তে পড়তে বললেন, "সময় হলেই ছাড়বে। তোর এত তাড়া কিসের?"

সাগর আর রাজু তখন জানালা দিয়ে মাথা বের করে বাইরে তাকাল, ট্রেনে বসে সময় কাটানো খুব সোজা, চারিদিকে এত মজার মজার জিনিস থাকে যে দেখতে দেখতেই সময় কেটে যায়। সেসব দেখতে দেখতেই হঠাৎ গার্ডের বাঁশি শোনা গেল, ট্রেনের ইঞ্জিন তখন কয়েকটা হুইসিল দিয়ে নড়তে শুরু করল। প্রথমে আস্তে আস্তে আরপর বেগ বাড়তে থাকে, খটাং খটাং শব্দ হয় আর ট্রেনটা কেমন মজার মতো দুলতে থাকে। রাজু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে, কত কী মজার জিনিস বাইরে! এমনিতেই যেসব জিনিস দেখলে একটুও মজা লাগার কথা না, কিন্তু ট্রেন থেকে দেখলে সেটাকেই কী অসাধারণ মনে হয়! একটা মানুষ উদাস মুখে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে আছে কিংবা একটা ছোট ছেলে ট্রেনের সাথে সাথে দৌড়াচ্ছে, যেন ট্রেনটাকে সে দৌড়ে হারিয়ে দেবে। একটা গরু ট্রেনের শব্দ শুনে লেজ তুলে দৌড়াচ্ছে আর তার পিছনে লাল চুলের একটা ছোট মেয়ে দৌড়াচ্ছে

সেটাকে ধরার জন্য, কী মজার দৃশ্য! শহরে রাস্তাঘাট আর গাড়ি ছুটার দেখে দেখে চোখ পচে গেছে, ট্রেন থেকে বিশাল ধানক্ষেত নদী নালা পুকুর দেখে রাজুর চোখ জুড়িয়ে যায়।

রাজুর ট্রেনে চড়তে খুব ভালো লাগে। যতক্ষণ ট্রেন চলছে ততক্ষণ বাইরে তাকিয়ে কত কী দেখা যায়, তারপর ট্রেন যখন কোনো-একটা স্টেশনে থামে, তখন আরও মজার ব্যাপার শুরু হয়। অন্ধ ফকিরের সুর করে গান, বাদামওয়ালা, ঝালমুড়ি আর কলা, চিরুনি আর খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা। প্লাটফর্মে লোহার ট্রাংকের উপর গ্রামের বউ জবুথবু হয়ে বসে থাকে, আর ছোট একটা ছেলে মুখে আঙুল দিয়ে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ-হঠাৎ দেখা যায় কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ কাউকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, মানুষটার মুখের দিকে তাকালে বুকের ভিতর জানি কীরকম করতে থাকে।

ট্রেনে উঠলে সবচেয়ে মজা লাগে লোকজনের কথা শুনতে। কত মজার মজার গল্প, রাজনীতির গল্প, ব্যাবসা-বাণিজ্যের গল্প, দেশ-বিদেশের গল্প, চোর ডাকাত বাটপারের গল্প। কত যে মজার মানুষ আর কত যে তাদের মজার মজার অভিজ্ঞতা, না শুনলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

ট্রেনটা অনেকক্ষণ একটানা চলতে চলতে শেষে একটা জংশনে থামল। ট্রেনটা প্রথম যখন এসে থামে তখন ভারি মজা লাগে, কিন্তু যদি বেশিক্ষণ থেমে থাকে তা হলে আবার মনে হতে থাকে, কী ব্যাপার, ছাড়ছে না কেন? সাগর একটু পরেই আবার শুরু করে দিল, "মামা, ট্রেন ছাড়তে না কেন?"

মামা কী-একটা ইংরেজি বই পড়ছিলেন, সেটা পড়তে পড়তে চোখ না তুলে বললেন, এটা বড় জংশন, অন্য ট্রেনের সাথে ক্রসিং হবে, ছাড়তে দেরি আছে।

রাজু বলল, "মামা, ট্রেন থেমে নামি?"

আজগর মামা বললেন, "নাম।"

সাগর বলল, "আমিও নামি?"

"নাম। বেশি দূরে যাবি না কিন্তু! দুজনে একসাথে থাকবি। যখন ঘণ্টা দেবে চলে আসিস।"

"ঠিক আছে মামা।"

আজগর মামা বই থেকে চোখ তুলে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, "ট্রেনের নিচে কাটা পড়িস না যেন!"

"যাও!" রাজু আর সাগর ট্রেন থেকে নেমে পড়ল।

আজগর মামা কোনোকিছুতেই না করেন না, এইজন্যে রাজু মামাকে এত পছন্দ করে। যদি আব্বা আর আম্মা থাকতেন তা হলে এতক্ষণে দুজনে মিলে ধমক দিয়ে তাদের বারোটা বাজিয়ে দিতেন।

ট্রেন থেকে নেমে রাজু সাগরকে নিয়ে প্রথমে ইঞ্জিনটা দেখতে গেল। কী বিশাল ইঞ্জিন—গুমগুম শব্দ করছে! দেখে মনে হয় যেন একটা বিশাল ডাইনোসর, কেউ বেঁধে রেখেছে বলে রেগে ওরকম শব্দ করছে। পুরো ট্রেনটাকে এই ইঞ্জিনটা টেনে নিয়ে যায়, দেখে বিশ্বাস হতে চায় না। ইঞ্জিনটা দেখে সাগর বলল, "আমি বড় হয়ে ইঞ্জিনের ড্রাইভার হব।"

রাজু সাগরের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, "সত্যি?"

"সত্যি। তুমি কী হবে?"

রাজু উদাস-উদাস মুখে বলল, "এখনও ঠিক করিনি। ফাইটার প্লেনের পাইলট হতে পারি।"

"প্লেনে কি হুইসিল আছে?"

"নেই।"

সাগর মাথা নাড়ল, "তা হলে আমি পাইলট হব না।"

রাজু সাগরের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না, সে নিজে যখন ছোট ছিল তখন তার ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে ফায়ার ব্রিগেডের ড্রাইভার হবে।

ইঞ্জিনটা দেখে তারা হেঁটে হেঁটে ফিরে আসছিল। স্টেশনে কতরকম মানুষ—কিছু বেদেনি বসে আছে কাচের চুড়ির কাঁপি নিয়ে। কিছু ন্যাংটো ছেলে ছোটাছুটি করছে, কোমরে কালো সুতো দিয়ে ঘুঙুর বাঁধা, সেটা টুং টুং করে বাজছে সাথে সাথে, দেখে মনে হয় খুব মজার একটা খেলা চলছে এখানে। একটা ছাগল খুব গম্ভীর মুখে একটা ঠোঙা চিবিয়ে যাচ্ছে, পাশেই একটা কুকুর—সেটা তার পাশে দিয়ে যেই হাঁটছে তাকে উঁকে যাচ্ছে, মনে হয় সেটাই যেন তার চাকরি। স্টেশনে ট্রেনের এত লোকজন, হৈচৈ—তার মাঝে একজন ময়লা কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে—লোকটির নিশ্চয়ই অনেক ঘুম পেয়েছে।

রাজু আর সাগর যখন হেঁটে নিজেদের কামরার কাছাকাছি চলে এসেছে হঠাৎ তাদের সামনে একটা হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। হৈচৈ শুরু হয়ে গেলে রাজুর সবসময় একটু ভয়-ভয় করে, কিন্তু সাথে সাথে সেটা কী জন্যে হচ্ছে দেখার খুব কৌতূহল হয়। সে সাগরের হাত শক্ত করে ধরে সেটা দেখতে এগিয়ে গেল। কাছে যেতে-না-যেতেই জায়গাটাতে খুব ভিড় জমে গেল, বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে কোনো একধরনের ধস্তাধস্তি হচ্ছে। রাজু কাছে গিয়ে দেখার চেষ্টা করে, আর সাগর সাথে সাথে চেঁচাতে শুরু করে, "আমি দেখব, আমি দেখব।"

সামনে মানুষের খুব ভিড়, রাজু ভালো করে দেখতে পারছিল না, কিন্তু যেটুকু দেখল তাতেই তার রক্ত হিম হয়ে গেল, একজন মানুষকে ধরে অনেকগুলি মানুষ মিলে মারছে। সে কী মার, ঘুষিতে মুখ ফেটে রক্ত বের হয়ে আসছে, চুলের মুঠি ধরে মুখে ঘুষি মারছে, মাটিতে ফেলে লাথি মারছে—কী ভয়ংকর একটা দৃশ্য! লোকটাকে মারতে মারতে মানুষগুলি আস্তে আস্তে আরও খেপে উঠছে, দেখে মনে হয় কেউ যেন আর পুরোপুরি মানুষ নেই, কেমন যেন জন্তু-জন্তু হয়ে উঠেছে। চিৎকার করে গালি দিতে দিতে একজন আরেকজনের ওপর দিয়ে মানুষটাকে মারছে—এরকম করে মারলে কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে!

মানুষের ধাক্কাধাক্কি হৈচৈ আরও বাড়তে থাকে, তার মাঝে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে রাজু আর সাগর পিছনে সরে আসে। রাজু তবু কিছুটা দেখতে পেরেছে, সাগর কিছু দেখেনি, তখনও তারস্বরে চিৎকার করে যাচ্ছে, "কী হয়েছে? আমি দেখব, আমি দেখব—"

যে-মানুষটাকে মারছে সেই মানুষটা এখন চিৎকার করে কাঁদছে, কিন্তু কারও ভিতরে কোনো মায়াদয়া নেই, মনে হয় তাকে মেরেই ফেলবে। কেন জানি হঠাৎ রাজুর শরীর খারাপ হয়ে যায়, মনে হতে থাকে বুঝি হড়হড় করে বমি করে ফেলবে। রাজু সাগরের হাত ছেড়ে দিয়ে দুই হাতে নিজের মুখ চেপে ধরল, আর ঠিক তখন দেখল আজগর মামা ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছেন, বিশাল গলায় হাঁক দিয়ে বলছেন, "কী হচ্ছে এখানে? কী হচ্ছে?"

লোকগুলি তখনও মারছে, আজগর মামা তার মাঝে হাত দিয়ে লোকগুলোকে থামাতে গিয়ে নিজেই মনে হয় দুই-চারটা কিল-ঘুষি খেয়ে গেলেন, কিন্তু যেসব গা না করে মামা আবার চিৎকার করে ধমক দিয়ে বললেন, "কী হচ্ছে এখানে? কী হচ্ছে?"

যে-কয়জন মানুষ খুব উৎসাহ নিয়ে পেটাচ্ছিল তাদের একজন চকচকে চোখে বলল, "পকেটমার স্যার। পকেট মেরেছে।"

"কার পকেট মেরেছে?"

"এই যে স্যার, এই সাহেবের।"

যে-সাহেবের পকেট মেরেছে সে এসে নিচে-পড়ে-থাকা মানুষটিকে কষে একটা লাথি মারতেই আজগর মামা খপ করে লোকটার কলার চেপে ধরে বললেন, "এই লোক তো পকেট মেরেছে। আপনি কী করছেন?"

লোকটা থতমত খেয়ে বলল, "কী করছি?"

"মানুষ মারছেন। এই লোকের যদি পকেট মারার জন্যে শাস্তি হয় আপনার তা হলে মানুষ মারার জন্যে শাস্তি হতে হবে।"

আশেপাশের যে-মানুষগুলো এতক্ষণ কিল ঘুষি লাথি মারছিল হঠাৎ তারা থতমত খেয়ে থেমে গেল। আজগর মামা চিৎকার করে বললেন, "আপনারা কি মানুষ না? একজন মানুষ কখনও আরেকজন মানুষকে এভাবে মারে!"

একজন, যে মারতে মারতে নিজের মুখে ফেনা তুলে ফেলেছিল, চোখ লাল করে বলল, "চোরকে মারব না তো কোলে তুলে রাখব?"

আজগর মামা মাথা ঘুরিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "না, তাকে কোলে তুলে রাখবেন না—তাকে পুলিশে দেবেন। দেশে আইন-কানুন আছে-সেটা সম্মান করতে হয়।"

আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কয়েকজন আবার মার মার করে এগিয়ে আসতে চাচ্ছিল, কিন্তু দেখা গেল বেশির ভাগ মানুষই হঠাৎ করে মারপিটে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। কয়েকজন আজগর মামার সাথে একমত হয়ে মাথা নেড়ে বলতে লাগল, "ঠিকই তো, একজন মানুষকে কি কখনও এভাবে মারে?"

ভিড়টা তখন হঠাৎ পাতলা হয়ে গেল এবং আজগর মামা নিচে-পড়ে-থাকা মানুষটাকে টেনে তুললেন, মনে হল লোকটার সারা মুখ থেঁতলে গেছে, রক্তে মাখামাখি। শরীরের কাপড়জামা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, পরনের লুঙ্গিটা খুলে যাচ্ছিল, কোনোমতে হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। মামা লুঙ্গিটা বেঁধে দিয়ে বললেন, "হাঁটতে পারবে?"

লোকটা রক্তমাখা একদলা থুতু ফেলে মাথা নাড়ল। আর ঠিক তখন দেখা গেল দুজন পুলিশ হেঁটে হেঁটে আসছে। পুলিশকে দেখামাত্রই যারা মারধোর করেছিল সাথে সাথে তারা সরে পড়ল।

রাজু আর সাগর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, মামা পুলিশ দুজনের সাথে কথা বলছেন। পুলিশ দুজন কথা শুনে মাথা নাড়ল, তারপর একজন মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে খুব আয়েশ করে ধোঁয়া ছেড়ে লোকটাকে ধরে নিয়ে গেল। মামা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন লোকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাচ্ছে—তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত মুছে উদ্বিগ্ন মুখে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলেন, দেখে মনে হল রাজু আর সাগরকে খুঁজছেন। রাজু আর সাগর তখন ছুটে গেল মামার কাছে। আজগর মামা দুই হাতে দুজনকে ধরে বললেন, "তোরা এখানে, আমি আরও ভাবলাম কোথায় গেলি!"

ঠিক তখন একজন বুড়োমতো লোক এগিয়ে এল, আজগর মামার খুব কাছাকাছি এসে নিচু গলায় বলল, "বাবা, আপনি আজকে একটা খুব বড় কাজ করেছেন।"

মামা কিছু না বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। লোকটা আবার বলল, "আপনি না থাকলে আজকে এই লোকটা খুন হয়ে যেত। সবার চোখে আমি খুন দেখেছিলাম—"

মামা অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়লেন। লোকটা মামার হাত স্পর্শ করে বলল, "আপনার জন্যে দোয়া করি বাবা। আরও মানুষ দরকার আপনার মতো।"

মামা একটু হাসলেন, লোকটা বলল, "যাই বাবা।"

মামা মাথা নাড়লেন আর লোকটা তখন হেঁটে হেঁটে চলে গেল।

ট্রেনে উঠে রাজু আজগর মামাকে বলল, "মামা, তোমার অনেক সাহস তাই না?"

মামা অবাক হয়ে বললেন, "সাহস? সাহস কোথায় দেখলি?"

"এই যে এতগুলি লোক খেপে ছিল, তুমি তার মাঝে গিয়ে কেমন করে লোকটাকে বাঁচালে—"

"এর মাঝে সাহসের কী দেখলি?"

"যদি লোকগুলি তোমাকে কিছু করত! কীরকম ভয়ানক লোক—"

মামা একটু হেসে বললেন, "তোদের একট কথা বলি, সবসময় মনে রাখিস। সব মানুষের মাঝে একটা ভালো জিনিস আছে—চোর ডাকাত খুনি বদমাশ—সবার মাঝে। সবসময় চেষ্টা করতে হয় সেই ভালো জিনিসটা বের করে আনার। চেষ্টা করে দেখিস, মানুষের মাঝের ভালো জিনিসটা বের হয়ে আসবে। যদি চেষ্টা করিস দেখবি অসম্ভব খুনে ডাকাত বদমাইশ মানুষও হঠাৎ করে ভালো একটা-কিছু করছে।"

"কিন্তু মামা—"

"কোনো কিন্তু নেই।" মামা মাথা নেড়ে বললেন, "মানুষকে বিশ্বাস করবি। মানুষ কখনও খারাপ হতে পারে না।"

ট্রেনটা আর ঘন্টা দুয়েক গিয়ে একটা ছোট স্টেশনে থেমে গেল। সেখানে থামবার কথা নয়, তাই লোকজন নেমে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে মুখ কালো করে ফিরে এল। সামনে একটা ছোট ব্রিজের কাছে লোকাল ট্রেনের বগি পড়ে আছে, সেটা না সরানো পর্যন্ত ট্রেন যাবে না। সবাই যখন সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলছে মামা তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চল।"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "কোথায়?"

"এখনও জানি না।"

"তা হলে?"

"চল তো বের হই আগে—হেঁটে, রিকশায়, বাসে, স্কুটারে করে চলে যাব। ট্রেন থেমে থাকলে কি জীবন থেমে থাকবে নাকি?"

ট্রেনের অন্য লোকজন অবাক হয়ে মামার দিকে তাকিয়ে রইল। মামা তার মাঝে টেনে তাঁর ব্যাগটা নামিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। মামার পিছুপিছু রাজু আর সাগর, আর তাদের দেখাদেখি আরও বেশ কয়েকজন। সবাই মিলে যখন হাঁটছে তখন তাদের দেখে ট্রেন থেকে লোকজন গলা বের করে খোঁজ নিতে শুরু করল। মামা মাথা নেড়ে বললেন, "আমি জানি না যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে কি না— গিয়ে খোঁজ খবর নেব।"

রাজু ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "মামা, যদি কোনোকিছু পাওয়া না যায়?"

"না পাওয়া গেলে নাই।"

"তখন কী হবে?"

মামা চোখ নাচিয়ে হাসলেন, "তা হলেই তো মজাটা হবে! রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে গান গাইতে গাইতে যাব। ধুলার মাঝে পা ডুবিয়ে হেঁটে যেতে কী মজা—কখনও হেঁটেছিস?"

রাজু মাথা নাড়ল, সে হাঁটেনি।

মামা জিব দিয়ে এরকম শব্দ করলেন, "ফাস্ট ক্লাস!"

রাজুর প্রথমে একটু সন্দেহ হচ্ছিল, কিন্তু একটু পরে দেখল সত্যি সত্যি মামার মাঝে দুশ্চিন্তার ছিটেফোঁটা নেই। কোথায় যাবেন কী করবেন সেটা যেন ব্যাপারই না, উলটো তাঁর মাঝে একটা ফুর্তির ভাব চলে এসেছে। ফুর্তি জিনিসটা মনে হয় সংক্রামক, একটু পরে রাজু আর সাগরেরও ফুর্তি লাগতে লাগল।

মাইলখানেক হেঁটেই একটা ছোট নদী এবং নদীর উপরে একটা ব্রিজ পাওয়া গেল, ব্রিজের সামনে দুটো মালগাড়ি রেললাইনের উপর কাত হয়ে পড়ে আছে। মালগাড়িকে ঘিরে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে গল্প করছে। তাদের দেখে মনে হল না ব্যাপারটা নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা আছে। মামা তাদের কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এলেন ক্রেন আনার জন্যে খবর পাঠানো হয়েছে, এখনও চার-পাঁচ ঘন্টার ধাক্কা।

আজগর মামা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে নদীর তীরে নেমে এলেন। সেখানে কিছু নৌকা বাঁধা ছিল, মামা গিয়ে নৌকার মাঝিদের সাথে এমনভাবে গল্পগুজব করতে শুরু করলেন যেন কতদিন থেকে তাদের সাথে পরিচয়। মাঝিদের কাছে খবর পাওয়া গেল নদী পার হয়ে অন্য তীরে গেলে ছোট রাস্তা আছে, কপাল ভালো থাকলে রিকশা পাওয়া যায়—সেই রাস্তা ধরে পাঁচ-ছয় মাইল গেলে বাস পাওয়া যাবে। শুনে মামা রাজুর দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে বললেন, দেখলি, বলেছিলাম না, কিছু-একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

আজগর মামা নদী পার হওয়ার জন্যে একটা নৌকা ভাড়া করলেন। সেই নৌকায় বসে জুতা খুলে পা ডুবিয়ে দিলেন নদীর পানিতে। মামার দেখাদেখি রাজু আর সাগরও চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের পা ছোট বলে পানি নাগাল পেল না, শুধু নৌকার দুলুনিতে ঢেউ এসে পা ভিজিয়ে দিতে লাগল। নদীটা দেখতে খুব ছোট মনে হচ্ছিল, কিন্তু পার হতে গিয়ে দেখা গেল সেটা খুব ছোট না। নদীর মাঝামাঝি বেশ স্রোত, পানিতে কেমন জানি কালচে সবুজ রং, তাকালে কেমন জানি ভয়-ভয় করে, মনে হয় পানির নিচে বুঝি রহস্যময় কিছু লুকিয়ে আছে।

নদী পার হয়ে মামার মনে হয় বেশ ফুর্তি হল। যখন দেখলেন ওপারে কোনো রিকশা নেই তখন ফুর্তিটা আরও বেড়ে গেল—পুরো রাস্তাটা হেঁটে হেঁটে যেতে পারবেন। মামা তখন তাঁর ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে গান ধরলেন। আজগর মামার অনেক গুণ, তিনি পারেন না এমন কোনো কাজ নেই, কিন্তু গানের ব্যাপারটিতে খোদা তাঁকে ছিটোফোঁটা কিছু দেননি। তাঁর গলায় কোনো সুর নেই, চড়া জায়গায় এলেই তাঁর স্বর চিরে যায় এবং হঠাৎ করে তাঁর গলা মোটা হয়ে যায়। তবে মামার দরদের কোনো অভাব নেই—শুধু দরদের কারণেই রাজু মামার গান শুনে হেসে ফেলল না, বরং নিজেও তাঁর সাথে গাইতে শুরু করল। রাজুর দেখাদেখি সাগরও। তাদের গান শুনেই হোক আর যে-কারণেই হোক, কিছুক্ষণের মাঝেই গ্রামের রাস্তায় তাদের পিছুপিছু ছোট বাচ্চাদের একটা দল হাঁটতে শুরু করে, রাজু একা হলে লজ্জায় মাথা কাটা যেত, কিন্তু আজগর মামার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

ঘন্টাখানেক হেঁটে সাগর বলল, সে আর পারেছে না—ট্রেনে করে সে আম্মার কাছে ফিরে যেতে চায়। শুনে আজগর মামা চোখ কপালে তুলে বললেন, "সে কী! এখনও তো মজার কিছু শুরুই করলাম না!"

সাগর বলল, তার আর মজা করার ইচ্ছে করছে না, পা ব্যথা করছে। তারপর চোখ-মুখ কুঁচকে ভেউভেউ করে কাঁদতে শুরু করল। আজগর মামা তখন তাকে কাঁধে তুলে নিলেন। কাঁধে উঠে সাগরের মতো একটু ভালো হল, চোখ মুছে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল।

সাগরকে ততক্ষণ ঘাড়ে করে নিতে হত কে জানে, কিন্তু ঠিক তখন টুনটুন করে একটা রিকশা হাজির হল। আজগর মামা মনে হয় একটু ব্যাজার হয়েই রিকশায় উঠলেন। গ্রামের রাস্তায় রিকশা অবিশ্যি খুব আরামের ব্যাপার নয়—হাঁটতে হয় না সত্যি, কিন্তু ঝাঁকুনিতে জীবন বের হয়ে যেতে চায়। শেষ পর্যন্ত যখন বড় রাস্তায় পৌঁছাল তখন যেন জানে পানি এল সবার। রাস্তার মোড়ে একটা বটগাছ, তার নিচে একটা ছোট দোকান, এটাই হচ্ছে বাসস্টেশন। দোকানটি একই সাথে মুদির দোকান, একই সাথে পান-সিগারেটের দোকান, আবার একই সাথে চায়ের দোকান। সামনে একটা ছোট বেঞ্চ। মামা বেঞ্চে পা তুলে বসে চায়ের অর্ডার দিলেন। মামাকে দেখেই কি না কে জানে, দোকানি চায়ের কাপ গরম পানিতে ধোয়া শুরু করল।

চা খেতে খেতে আজগর মামা দোকানির সাথে গল্প শুরু করলেন। তার কাছেই জানা গেল একটু পরেপরেই বাস আসে, কাজেই তাদের যেতে কোনো অসুবিধে হবে না। দোকানির কথা সত্যি, কারণ চা খেতে খেতেই একটা বাস এসে হাজির। বাসের কন্ডাক্টর নিচে নেমে বাসের গায়ে থাবা দিতে দিতে তারস্বরে চ্যাঁচাতে শুরু করল। মামা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা তিনজন যেতে পারব?"

কন্ডাক্টর মামার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল, "কোনো অসুবিধা নাই, উঠেন।"

"সাথে বাচ্চা ছেলে আছে, বসার জায়গা দরকার।"

"বসার জায়গা করে দেব। কোনো অসুবিধা নাই।"

"তোমার বাস তো দেখি মুড়ির টিন! সব জায়গায় থামতে থামতে যাবে, নাকি একবারে যাবে?"

"ডিরেক্ট বাস, ডিরেক্ট। আর কোথাও থামাথামি নাই—"

কন্ডাক্টর মামার সাথে কথা বলতে বলতে চোখের কোনা দিয়ে কী যেন দেখছিল, হঠাৎ দূরে কী-একটা দেখে সে খুব চঞ্চল হয়ে ওঠে, মামা, রাজু আর সাগরকে প্রায় ঠেলে তুলে বাসের গায়ে দমাদম মারতে শুরু করল। সাথে সাথে বাস ছেড়ে দিল।

ভিতরে খুব ভিড়, লোকজন গাদাগাদি করে আছে। তার মাঝে কন্ডাক্টর পিছলে পিছলে ঢুকে গিয়ে একটা সীট থেকে নিরীহ দুইজন লোককে ধমকাধমকি করে তুলে দিয়ে আজগর মামাকে ডাকতে থাকে। মামা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "সে কী! ওদের তুলে দিচ্ছ কেন?"

কন্ডাক্টর অবিচল মুখে বলল, "কোনো অসুবিধা নাই। সীটের জন্য আলাদা ভাড়া। না দিলে খাড়াইয়া যাবে।"

মামা রাজু আর সাগরকে নিয়ে চাপাচাপি করে বসলেন। বাসের সীটগুলি এত কাছাকাছি যে ব্যাগগুলি পর্যন্ত রাখার জায়গা নেই। অনেক কষ্ট করে সীটের ফাঁকে সেগুলি ঢোকানো হল।

বাস ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ছুটে চলছে, তার ভিতরে কন্ডাক্টর দুই হাত ছেড়ে অন্য যাত্রীদের গায়ে হেলান দিয়ে ভাড়া নিতে থাকে। রাজু কিছুক্ষণের মাঝে আবিষ্কার করল কন্ডাক্টর মানুষটির কথাবার্তা খুব খারাপ। বিশেষ করে যেসব মানুষ একটু গরিব ধরনের

তাদের সাথে এমনভাবে কথা বলে যে শুনে গা জ্বলে যায়। লোকজনকে ধমক দিয়ে গালিগালাজ করে বাসের মাঝে সে মোটামুটি একটা ভয়ংকর অবস্থা তৈরি করে ফেলল।

বাসে ওঠার সময় কন্ডাক্টর বলেছিল বাসটা আর কোথাও থামবে না, কিন্তু দেখা গেল আসলে কথাটি সত্যি নয়। পাঁচ-দশ মিনিট পরেপরে বাসটি থামতে লাগল। শুধু তা-ই না, এমনিতেই বাসে কারও বসার জায়গা নেই, তার মাঝে কন্ডাক্টর ঠেলে ঠেলে আরও মানুষ এনে ঢোকাতে লাগল। কিছুক্ষণের মাঝে মনে হল, বাস নয়, এটি বুঝি পল্টনের জনসভা। এই ভিড়ের মাঝে একজন একটা পাহাড়ি হালুয়া বিক্রি করতে লাগল, এটি নাকি স্বপ্নপ্রদত্ত ঔষধ এবং এটি খেলে এমন কোনো অসুখ নেই যেটি ভালো হয় না। লোকজন মনে হয় আজকাল একটু বুদ্ধিমান হয়েছে, কারণ, ঔষধের দাম কমাতে কমাতে প্রায় বিনি পয়সায় দিয়ে দিচ্ছিল, তবু কেউ একটি শিশি পাহাড়ি হালুয়া কিনল না।

বাসের যাত্রাটা কিছুক্ষণের মাঝে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল, কারণ এই বাসটি যেসব যাত্রীকে থেমে থেমে তুলে নিচ্ছে তারা নিশ্চয়ই পিছনের বাসের যাত্রী। পিছনের বাসটি যাত্রীদের জন্যে এই বাসটি ধরে ফেলল আর তখন দুই বাসে রেস শুরু হয়ে গেল। এত বড় বাস যে এত জোরে ছুটতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হয় না, দেখে মনে হল এবারে একটা অ্যাকসিডেন্ট না হয়ে যায় না।

ঠিক এরকম সময় বাসের কন্ডাক্টর গরিব ধরনের একজন যাত্রীকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে বসে। মনে হয় ঠিক এই জিনিসটারই দরকার ছিল, হঠাৎ করে তিড়িং করে সামনে বসে থাকা একজন লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, মানুষটা লিকলিকে শুকনো এবং কালো, চোখে চশমা এবং মুখে গোঁফ, দেখে মনে হয় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মানুষটি চিৎকার করে বলল, "বাস থামা!"

কন্ডাক্টর চোখ পাকিয়ে বলল, "বাস কি আপনার বাবার?"

আর যায় কোথায়, লিকলিকে মানুষটি এই ভিড়ের মাঝে গলে কীভাবে কীভাবে এসে কন্ডাক্টরের শার্টের কলার চেপে ধরে বলল, "কী বললি হারমজাদা?"

কন্ডাক্টর এবার একটু ঘাবড়ে গেল, তবু ঘাড় বাঁকা করে বলল, "লাইনের বাস কি আপনার কথায় থামানো যায়?"

"থামা বলছি এক্ষুনি।"

"কেন?"

"তোমার বাস জ্বালিয়ে দেব।"

সাথে সাথে সমস্ত বাসে একটা আনন্দধ্বনি উঠল এবং বেশির ভাগ প্যাসেঞ্জার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "জ্বালিয়ে দাও। শালার বাস জ্বালিয়ে দাও।"

কয়েকজন ছুটে গেল ড্রাইভারের কাছে, চুলের মুঠি ধরে বলল, "থামা শালা বাস।" কিছু মানুষ এসে কন্ডাক্টরকে বাসের দেয়ালে ঠেসে ধরল। মনে হয় দু-চারটে কিলঘুষিও পড়ল, অন্যেরা বাসের ছাদে মেঝেতে লাথি মারতে লাগল। অবস্থা বেগতিক দেখে বাসের ড্রাইভার তাড়াতাড়ি রাস্তার পাশে বাস এনে থামায়, সাথে সাথে পাশ দিয়ে পিছনের বাসটি হুশ করে বের হয়ে গেল।

বাস থামা মাত্রই লিকলিকে মানুষটি বাস থেকে নেমে চিৎকার করে বলল, "সবাই নামেন ভাই বাস থেকে, এই বাস জ্বালিয়ে দেব।"

কিছু-কিছু প্যাসেঞ্জারের মনে একটু সন্দেহ ছিল, কিন্তু দেখা গেল লিকলিকে মানুষটি সত্যিই বাস পুড়িয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে। তার আরও কিছু অ্যাসিস্টেন্ট জুটে গেছে,

তারা সবাই মিলে সত্যি সত্যি বাস পোড়ানোর ব্যবস্থা করতে থাকে। একজন গিয়ে পেট্রোল ট্যাংকটা খুলে সেখানে একটা রুমাল ভিজিয়ে আনে, একটা দেয়াশলাইও বের হয়ে আসে।

রাজু ভয় পেয়ে বলল, "মামা, সত্যি, সত্যি বাস পুড়িয়ে দেবে?"

মামা দাঁত করে হাসলেন, বললেন, "মনে হয়। এই লাইনে এখনও একটা দুইটা বাস পোড়ানো হয়নি, তাই কন্ডাক্টরগুলির বড় বাড় বেড়েছে।"

"কিন্তু মামা, সত্যি সত্যি বাস পুড়িয়ে দেবে? তুমি কিছু বলবে না?"

মামা চোখ মটকে বললেন, "দেখি না কী হয়। এই কন্ডাক্টর মানুষটা বড় ফাজিল, ব্যাটার খানিকটা শাস্তি হওয়া দরকার। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী মামা?"

"আমি কখনও বাস পোড়ানো দেখিনি। দেখি কেমন করে পোড়ায়।"

লিকলিকে মানুষটি পেট্রোল-ভেজা রুমালে আগুন ধরিয়ে বাসের মাঝে ছুড়ে দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই কন্ডাক্টর, বাস-ড্রাইভার আর দুজন হেল্পার ছুটে এসে আগুনটা কেড়ে নিয়ে পা দিয়ে দাপিয়ে নিভিয়ে দিল। বাসের যাত্রীরা তখন বাস পোড়ানোর পক্ষে এবং বিপক্ষে এই দুই দলে ভাগ হয়ে একটা তুলকালাম শুরু কাণ্ড করে দিল। মামা পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখে মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটিতে খুব মজা পাচ্ছেন। রাজু ভয় পেয়ে বলল, "মামা, কিছু-একটা করো!"

সাগর তখন ভ্যাঁ করে কেঁদে দিল। সাগরের কান্নার জন্যেই হোক আর রাজুর কথাতেই হোক মামা তখন এগিয়ে গিয়ে তার রাজখাঁই গলায় একটা হাঁক দিলেন, "এই যে ভাই, সবাই আমার কথা শোনেন।"

মামার গলার আওয়াজ না শুনে কোনো উপায় নেই, সবাই মামার দিকে ঘুরে তাকাল।

মামা বললেন, "এই ব্যাটা কন্ডাক্টর ভারি ফাজিল। ব্যাটার একটা শিক্ষা হওয়া দরকার।"

"দরকার!" লোকজন চিৎকার করে বলল। যারা কন্ডাক্টরের শার্টের কলার ধরে রেখেছিল তারা এই সময়ে তাকে ধরে একটা শক্ত ঝাঁকুনি দিল।

মামা গলা উঁচিয়ে বললেন, "বাসটা পোড়ালে শাস্তি তো কন্ডাক্টরের হবে না, শাস্তি হবে বাস-মালিকের। এই ব্যাটা কন্ডাক্টর তো বাস-মালিককেও ঠকিয়ে প্যাসেঞ্জার তুলছে।"

"সত্যি কথা।" লোকজন হুঙ্কার দিল।

"তা ছাড়া আমাদের সবারই তো বাড়ি যাওয়া দরকার। এই সময়ে বাস পোড়ালে আবার বাড়ি পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে। পুলিশে ফুলিশে খবর দিলে আবার অন্য ঝামেলা। আমি বলি কি—"

লোকজন মামার মুখের দিকে তাকাল, "কী?"

"এই কন্ডাক্টরকে একটা শাস্তি দিয়ে আমরা বাসে করে বাড়ি যাই।"

"ঠিক কথা।" লিকলিকে মানুষটা বলল, "ঘুষি মেরে শালার সামনেই দুটো দাঁত ফেলে দিই—"

"না-না, তার দরকার নেই। একে বরং এখানে রেখে যাই। তা হলে আর রাস্তা থেকে লোক তুলতে পারবে না, আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাব।"

অনেক মানুষ মামার কথায় রাজি হল, উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা কমে এসেছে, এখন সবাই চাইছে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান। লিকলিকে মানুষটা শুধু তখনও চিৎকার করে যাচ্ছে, "না, এত সহজে ছাড়লে হবে না। ধরে আগে শক্ত মার দিই—"

কয়েকজন মানুষ তখন লিকলিকে মানুষটাকে শান্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু সে সহজে শান্ত হবার পাত্র নয়—মানুষ রোগা হলে মনে হয় তাদের রাগ খুব বেশি হয়।

শেষ পর্যন্ত লিকলিকে মানুষটাও রাজি হল, কিন্তু এক শর্তে। কন্ডাক্টরকে একটা সুপারি গাছে বেঁধে যাবে। সে কারও কথা শুনল না, একটা গামছা দিয়ে কন্ডাক্টরকে রাস্তার পাশে একটা সুপারি গাছে বেঁধে ফেলল।

বাস-ড্রাইভার এবং হেল্পার দুজন একটা কথাও বলল না, তাদের মুখ ফ্যাকাশে এবং রক্তশূন্য, বাসটি যে সত্যি সত্যি পুড়ে যায়নি এতেই তারা খুশি। মামা তখন সবাইকে বাসে উঠে বাস ছেড়ে দিতে বললেন, বাসকে ঘিরে তখন আশেপাশের অনেক মানুষ জমা হয়ে গেছে। বাসটা যখন ছেড়ে দিচ্ছিল মামা জানালা দিয়ে গলা বের করে তাদের বললেন, "ভাই, লোকটাকে খুলে দেবেন একটু পরে। মনে হয় অনেক শাস্তি হয়েছে।"

এর পর বাস আর কোথাও থামল না, টানা চার ঘণ্টা চলে যখন শহরে পৌঁছাল তখন রাত দশটা। আম্মা বিস্কুটের প্যাকেট আর পানি দিয়েছিলেন বলে রক্ষা, সেটা দিয়েই রাতের খাবার সারতে হল। বাসে বসে বসে রাজু আর সাগর মামার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। বাস থেকে নামার সময় তারদেরকে ডেকে তুলে নামালেন, আধো ঘুমে তারা মামার সাথে গিয়ে স্কুটারে উঠে বসল। মামা বললেন, "ঘুমাবি না কিন্তু, বাসায় গিয়ে খেতে হবে। জেগে থাক।"

রাজু আর সাগর জেগে থাকতে চেষ্টা করল, টের পাচ্ছিল পাহাড়ি উঁচুনিচু রাস্তায় স্কুটার ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু সারাদিনের ক্লান্তি হঠাৎ যেন চোখে এসে ভর করেছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল, হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে আবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল—এর মাঝে কীভাবে জানি দুজনেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

৩. তৃতীয় দিন

রাজুর ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। নূতন জায়গায় রাজু বেশি ঘুমাতে পারে না। তা ছাড়া আজগর মামার বাসাটা একটা জঙ্গলের মাঝে, চারপাশে গাছগাছালি, সারারাত নানারকম জন্তু-জানোয়ার, নাম-না-জানা বিচিত্র সব পাখি ডাকাডাকি করে। এরকম জায়গায় বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা খুব সোজা ব্যাপার না। রাজু চোখ কচলে বাসি ঘুম দূর করে বিছানা থেকে নামল। সাগর এখনও ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে। বিশাল বড় একটা ঘরে, আরও বড় একটা বিছানায় আজগর মামা কাল রাতে তাদের শুইয়ে দিয়েছিলেন, তাদের কিছু মনে নেই। রাজুকে নিশ্চয়ই মামা কোলে করে আনেননি, সে নিশ্চয়ই হেঁটে হেঁটে এসেছে, কিন্তু রাজু এখন আর কিছু মনে করতে পারে না।

রাজু বিছানা থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বাইরে কতরকম গাছপালা, তার মাঝে থেকে কত বিচিত্র রকম শব্দ আসছে! পাখির ডাক, পোকার ডাক, বাতাসের শব্দ, গাছপালার পাতার শব্দ, ডালের সাথে ডালের ঘষা খাওয়ার শব্দ, পাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ, শুকনো পাতা উড়ে যাবার শব্দ, তার মাঝে সরসর করে কিছু-

একটা ছুটে যাবার শব্দ। কী আশ্চর্যই-না লাগছে শুনতে! তার উপর হালকা কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে আছে, দেখে মনে হয় যেন এটা সত্যি নয়, যেন কেউ স্বপ্ন থেকে তুলে এনে দিয়েছে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই রাজু দেখল আজগর মামা হেঁটে হেঁটে আসছেন—মানুষ যেরকম আস্তে আস্তে আপন মনে হাঁটে সেরকম হাঁটা নয়, মামা হাঁটছেন ধপ ধপ করে, দুই হাত নেড়ে নেড়ে, দেখে মনে হচ্ছে বুঝি ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন। জানালার নিচে এসে মামা উপরে তাকিয়ে রাজুকে দেখতে পেলেন, তখন হাঁটা থামিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "উঠে গেছিস?"

রাজু মাথা নাড়ল। মামা বললেন, "আয় বাইরে আয়, দেখ কী সুন্দর সকাল।"

রাজু দরজা খুলে বাইরে এল, মামা তখন ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ধরার চেষ্টা করছেন, রাজু বলল, "তুমি এত জোরে জোরে হেঁটে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিলে?"

"যাব আবার কোথায়? সকালে হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো, জানিস না?"

"হাঁটা কোথায় মামা? তুমি তো রীতিমতো দৌড়াচ্ছিলে!"

"মেনি-বেড়ালের মতো হাঁটব নাকি? হাঁটব বাঘের মতো। বাঘের মতো হাঁটলে কার্ডিও ভাসকুলার ব্যায়াম হয়। জোরে জোরে হেঁটে হার্ট বিট বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে ফেলতে হয়, তারপর সেই হার্ট বিট আধ ঘণ্টা ধরে রাখতে হয়।"

"তুমি আধা ঘণ্টা ধরে হাঁটছ?"

মামা মাথা নাড়লেন, "সকালে হাঁটতে কী ভালো লাগে! হেঁটে দেখিস। দিনের একেকটা সময় হচ্ছে একেক রকম, সকালটা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর। সকালবেলা সবকিছু পবিত্র, সবকিছুতেই শান্তি। সবকিছু নরম।"

"আর দুপুর?"

"দুপুর হচ্ছে ব্যস্ততার সময়। দুপুরে কারও অবসর নেই। দুপুরে সবার জন্যে শুধু কাজ আর কাজ!"

"আর রাত?"

"রাত? রাত হচ্ছে বিশ্রামের সময়। অবিশ্যি তুই যদি চোর হোস তা হলে রাত হচ্ছে চুরি করার সময়। তখন দুপুর হবে তোর বিশ্রামের সময়।

রাজু হি হি করে হেসে বলল, "তার মানে যারা দুপুরে ঘুমায় তারা সবাই চোর?"

মামাও হেসে ফেললেন, বললেন, "কে জানে, হয়তো চোর।"

রাজু বারান্দার সিঁড়িয়ে বসে বসে মামার ব্যায়াম দেখতে লাগল। তার হঠাৎ করে আব্বা আর আম্মার কথা মনে পড়ল, কী করছে এখন আব্বা আর আম্মা? এখনও নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছেন। ঘুম থেকে উঠে কী করবেন, আবার কি ঝগড়া করবেন?

মামা ব্যায়াম শেষ করে উঠে এসে রাজুকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে নরম গলায় বললেন, "সাগর এখনও ঘুমাচ্ছে?"

"হুঁ।"

"যা, তুলে দে ঘুম থেকে। হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা করবি। কাল রাতেও কিছু খাসনি। কী খাবি বল। গোশত-পরোটা? আমাদের চান মিয়া একেবারে ফাস্ট ক্লাস গোশত-পরোটা তৈরি করে। বেহেশতি পরোটা। একবার খেলে তার স্বাদ মুখে লেগে যাবে, জন্মেও ভুলতে পারবি না।"

সাগরকে ঘুম থেকে তুলে হাতমুখ ধুয়ে যখন রাজু নাস্তা করতে এল তখন দেখা গেল বেহেশতি পরোটা তৈরি হয়নি। বিখ্যাত বাবুর্চি চান মিয়া— যে বেহেশতি পরোটা তৈরি করে, সে বাড়িতে গিয়েছিল এখনও ফিরে আসেনি। তাকে খবর পাঠানো হয়েছে, সে নিশ্চয়ই দুপুরবেলাতেই চলে আসবে। আজগর মামা অবিশ্যি সেটা নিয়ে বেশি ঘাবড়ে গেলেন না, সকালে নাস্তা করার জন্যে বিশাল একটা বাটিতে অনেকগুলি ডিম ভেঙে সেটা খুব উৎসাহ নিয়ে ফেটাতে থাকলেন। রাজু আর সাগরকে বললেন, "সকালের নাস্তা হবে টোস্ট, অমলেট আর হরলিক্স। দুপুরবেলা খাব কাবাব-পরোটা, রাতে খুনা খিচুড়ি।"

রাজুর যেরকম খিদে লেগেছে সে ইচ্ছে করলে এখন লবণ ছিটিয়ে জুতা স্যান্ডেল পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে পারে। মামা বললেন, "আয়, হাত লাগা। পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কাট। সাথে কাঁচামরিচ। পেঁয়াজ কাটার সময় মুখ হাঁ করে নিশ্বাস নিবি, তা হলে দেখিস চোখে পানি আসবে না।"

সাগর রুটি টোস্ট করল, রাজু পেঁয়াজ মরিচ কেটে দিল এবং মামা ডিম ভাজা করলেন। তারপর সবাই মিলে খেতে বসল।

রাজু প্রায় রাক্ষসের মতো খেল, আম্মা থাকলে আজ খুব খুশি হতেন। খাবার পর এক গ্লাস করে হরলিক্স খেয়ে রাজু আর সাগর মামার সাথে বারান্দায় গিয়ে বসল। মামা মোটা মোটা কিছু কলা নিয়ে বসেছেন, রাজুকে আর সাগরকে একটা করে ছিঁড়ে দিয়ে বললেন, "খাবার পর সবসময় ফল খেতে হয়। নে খা।"

সাগর বলল, "এই কলা এত মোটা কেন মামা?"

আজগর মামা কলা ছিলে তাতে কামড় দিয়ে বললেন, "এর নাম বিচিকলা। এর মাঝে তিন লাখ তেত্রিশ হাজার বিচি। তবে খেতে ফার্স্ট ক্লাস।"

মামা কলাটা খেয়ে মুখ থেকে পুট পুট করে বিচিগুলি বের করতে থাকেন, দেখে মনে হয় তারি বুঝি মজা। সাগর আর রাজু কলা খেয়ে পুট পুট করে তার বিচি বের করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল, মামার অনেক গুণ, তার কিছু-কিছু কোনোদিন তারা নাগালে পাবে না।

বাইরে তখন একটু বেলা হয়েছে, মামা ঘড়ি দেখে বললেন, "সকালে ঘুম থেকে ওঠার সুবিধা কী জানিস?"

"কী মামা?"

"সারাটা দিন লম্বা হয়ে যায়। কত কী করা যায় এক দিনে! চল এখন বের হই। জুতা-মোজা পর।"

রাজু উৎসাহে জুতা পরতে পরতে বলল, "কোথায় যাব মামা?"

"আমার মোটর-সাইকেল করে ঘুরে আসব। এখানে একটা ঝরনা আছে, পাহাড়ি ঝরনা। অপূর্ব সুন্দর, তোদের দেখিয়ে আনি। কাল নিয়ে যাব জিন্দা আগুন দেখাতে।"

"সেটা কী মামা?"

"মাটি ফেটে গ্যাস বের হচ্ছে—সেখানে দাউদাউ করে দিনরাত আগুন জ্বলছে। দেখলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবি। আর পরশু নিয়ে যাব কিংডনাগের মন্দিরে। দেখবি তান্ত্রিক সাধু বসে আছে। অমাবস্যা রাতে নাকি এখনও নরবলি দেয়।"

"সত্যি?"

"সত্যি-মিথ্যা জানি না, লোকে বলে। চল চল, দেরি করিস না।"

মামা তাঁর মোটর-সাইকেলে বসলেন, মামার পিছনে বসল সাগর, সাগরের পিছনে রাজু। মামা বললেন, "ধরেছিস তো শক্ত করে?"

রাজু আর সাগর বলল, "ধরেছি মামা।"

মামা স্টার্টারে লাথি দিতেই মোটর-সাইকেল গর্জন করে উঠল, তারপর মামা পা তুলে মোটর-সাইকেল ছুটিয়ে নিয়ে চললেন। রাজু আগে কখনও মোটর সাইকেলে ওঠেনি, তার কী যে মজা লাগল সে আর বলার মতো নয়! মনে হতে লাগল বুঝি সে উড়ে যাচ্ছে।

বাতাসের ঝাপটা লাগছে মুখে, রাস্তা পিছনে ছুটে যাচ্ছে, রাস্তার পাশে গাছপালা হুশ হুশ করে বের হয়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে বলল, "আরও জোরে মামা—আরও জোরে।"

মামা সত্যি সত্যি আরও জোরে ছোটালেন। এতক্ষণে সাগরও মজা পেয়ে গেছে, সে চিৎকার করে বলল, "আরও জোরে।"

মামা আরও জোরে ছুটলেন, মোটর-সাইকেল জীবন্ত প্রাণীর মতো গর্জন করতে লাগল। রাজু বলল, "আরও জোরে মামা।"

আজগর মামা মাথা পিছনে ঘুরিয়ে বললেন, "আরও জোরে গেলে তো উড়ে যেতে হবে!"

"উড়েই যাও মামা-উড়ে যাও।"

মামা শরীর নাড়িয়ে নাড়িয়ে উড়ে যাবার ভান করতে লাগলেন। তাই দেখে সাগর আর রাজু হিহি করে হাসতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক গিয়ে মামা একটা পাহাড়ি রাস্তায় যেতে শুরু করলেন। এরকম রাস্তায় হেঁটে যেতেই জান বের হয়ে যাবার কথা, মোটর-সাইকেলে যাবার তো কোনো প্রশ্নই আসে না, কিন্তু মামাকে সেটা নিয়ে খুব চিন্তিত দেখা গেল না, চোখ বন্ধ করে মোটর সাইকেল ছুটিয়ে নিতে লাগলেন। ঝাঁকুনি খেতে খেতে যখন রাজুর মনে হতে লাগল তার মগজ এখন নাক-মুখ দিয়ে বের হয়ে আসবে তখন মামা থামলেন। সামনে একটা উঁচু পাহাড়, আর সেই উঁচু পাহাড় থেকে ঝরঝর করে পানি পড়ছে। নিচে বড় বড় পাথর, সেখানে পড়ে পানি চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাচ্ছে। জায়গাটি নির্জন সুমসাম— বহু দূরে একটা পাহাড়ের উপর রঙিন কাপড় পরে কয়টা পাহাড়ি মেয়ে বসে আছে, এ ছাড়া আশেপাশে কোথাও কেউ নেই।

মামা মোটর-সাইকেল থেকে নেমে বললেন, "কী বলেছিলাম, সুন্দর না?"

রাজু আর সাগর মাথা নাড়ল।

"এখন তো ঝরনাটা শুকিয়ে গেছে। বর্ষাকালে এলে দেখবি কী ভয়ংকর ঝরনা—দুই মাইল দূর থেকে এর গর্জন শোনা যায়!"

"সত্যি?"

"সত্যি। মামা মাথা নাড়লেন, বর্ষাকালে শুধু একটা সমস্যা।"

"কী সমস্যা মামা?"

"জোঁক। খুব জোঁকের উপদ্রব হয় তখন।"

"জোঁক? ইয়াক থুঃ—" সাগর মুখ কুঁচকে মাটিতে থুতু ফেলল।

রাজু পানির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "পানিতে নামি, মামা?"

"ইচ্ছে হলে নাম।"

রাজু জুতো খুলে পানিতে নামল, পরিষ্কার টলটলে পানি, আর কী ঠান্ডা, রাজুর সারা শরীর কেমন জানি শিরশির করে ওঠে! সাগর কিছুক্ষণ জোঁকের ভয়ে তীরে দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত আর লোভ সামলাতে পারল না, সেও জুতো খুলে নেমে এল। ঝকঝকে

পরিষ্কার পানিতে ছোট ছোট মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাগর আর রাজু খানিকক্ষণ সেই মাছ ধরার চেষ্টা করল, এইটুকুন ছোট ছোট মাছ, কিন্তু কী বুদ্ধি সেই মাছের, কিছুতেই ধরা দিল না।

মামা একটা পাথরে লম্বা হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁকে দেখে মনে হতে লাগল আকাশে বুঝি কেউ একটি বই খুলে রেখেছে আর মামা একমনে সেই বইটা পড়ছেন।

রাজু আর সাগরকে নিয়ে মামা ঘণ্টাখানেক ঝরনার কাছে থাকলেন, তারপর ঘড়ি দেখে বললেন, "চল বাসায় যাই। খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে জিন্দা আগুন দেখতে যাব।"

পানিতে লাফঝাঁপ দিতে ভারি মজা, এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু জিন্দা আগুনের কথা শুনে দুজনেই লাফিয়ে উঠে জুতো-মোজা পরে নিতে থাকে।

ফিরে আসার সময় মামা বাজারের কাছে একটা রেস্টুরেন্টে থামলেন। দুপুর হয়ে গেছে, বাসায় ফেরার আগে খেয়ে নিতে চান। রাজু একবার বিখ্যাত বাবুর্চি চান মিয়া এবং তার বেহেশতি পরোটার কথা মনে করিয়ে দিল, কিন্তু আজগর মামা আর ঝুঁকি নিলেন না। বাসায় গিয়ে যদি দেখা যায় চান মিয়া এখনও এসে পৌঁছায়নি, আবার তা হলে পাউরুটি আর ডিম ভাজার পরে বিচিকলা খেতে হবে।

খেয়েদেয়ে বাসায় ফিরে আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে গেল। আজগর মামা এই এলাকায় খুব জনপ্রিয় মানুষ বলে মনে হল, যার সাথেই দেখা হয় সেই মামার সাথে খানিকক্ষণ কথা বলে নেয়।

বাসায় পৌঁছে মামা যখন তাঁর মোটর-সাইকেলটা তুলে রাখছেন তখন রাজু বলল, "মামা, আমি তোমার মোটর-সাইকেলটা একটু চালাই?"

মামা চোখ কপালে তুলে বললেন, "কী বললি?"

"তোমার মোটর-সাইকেলটা চালাই?"

"তুই মোটর সাইকেল চালাতে পারিস?"

রাজু মাথা নাড়ল, "না, পারি না।"

"তা হলে?"

"তুমি শিখিয়ে দেবে।"

অন্য কোনো মানুষ হলে এই সময়ে রাজুকে একটা বাঘা ধমক দেওয়া হত, কিন্তু আজগর মামার কথা আলাদা। মামা কয়েক সেকেণ্ড রাজুর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "নে, দেখি পারিস কি না!"

রাজু মোটর সাইকেলটার ধরল, দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু বেশ ভারী, শক্ত করে ধরে রাখতে হয়। মামা বললেন হাত দিয়ে ঠেলে একটু ঘুরিয়ে আনতে। রাজু বেশ সহজেই ঘুরিয়ে আনল। তারপর মামা বললেন সীটে বসতে। রাজু সীটে বসল, মামা তখন তার দুই পা কতটুকু যায় লক্ষ করলেন। কিছু-একটা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "সাইকেল চালাতে পারিস তো?"

"পারি মামা।"

"ঠিক আছে, তা হলে দেখা যাক তুই সত্যি সত্যি মোটর-সাইকেল চালাতে পারিস কি না। ব্যাপারটা যত সোজা মনে হয় আসলে তত সোজা না। ব্যালেন্স রাখার ব্যাপারটা সোজা হতে পারে, কিন্তু ক্লাচ চেপে ধরে গিয়ার পালটানো ব্যাপারটা এত সোজা না। প্রথম প্রথম ফার্স্ট গিয়ারেই প্র্যাকটিস করা যাক, দেখি কতদূর কী হয়।"

সাগর একটু দূর থেকে হিংসা-হিংসা চোখে তাকিয়ে রইল, আর তার মাঝে রাজু আজগর মামার কথামতো চাবি দিয়ে অন করে স্টার্টারে লাথি মেরে মোটর-সাইকেলের ইঞ্জিন চালু করল। ব্রেকটা শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছিল মামার কথামতো, আস্তে আস্তে ব্রেকটা ছেড়ে দিয়ে সে খুব ধীরে ধীরে এগুতে শুরু করে। মামা সাথে সাথে একটু এগিয়ে গেলেন, দেখা গেল রাজু একা একাই বেশ চালিয়ে নিয়ে গেল। খানিক দূর গিয়ে সে ব্রেক চেপে মোটর-সাইকেলটা থামিয়ে দিয়ে মামার দিকে ঘুরে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল।

মামা বললেন, "এই তো হয়েছে, এখন ঘুরে আয় দেখি!"

রাজু নিজে নিজেই ঘুরে এল।

মামা পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "এই তো মোটামুটি শিখে গেছিস, আজকে এই পর্যন্তই থাক—কাল আবার চালাবি।"

রাজু বলল, "মামা, আরেকটু চালাই? বেশি দূরে যাব না, এই উঠানেই ঘুরে আসব, তুমি বসে বসে দেখো।"

অন্য কেউ হলে রাজুকে একটা বাঘা ধমক দিত, কিন্তু মামা বেশ সহজে রাজি হয়ে গেলেন। বারান্দায় একটা চেয়ার এনে খবরের কাগজ নিয়ে বসলেন। সাগর হিংসা-হিংসা চোখে তাকিয়ে রইল, আর তার মাঝে রাজু বিশাল মোটর-সাইকেলটা চালিয়ে বেড়াতে লাগল।

কিছুক্ষণের মাঝেই আজগর মামা আবিষ্কার করলেন, মোটর-সাইকেল চালানোর ব্যাপারে রাজুর বেশ নিজস্ব একটা দক্ষতা আছে। ব্যাপারটা সে এত চমৎকারভাবে আয়ত্ত করে ফেলল যে মামা নিজে থেকেই তাকে কেমন করে গিয়ার পালটাতে হয় শিখিয়ে দিলেন। মামার ধারণা ছিল ব্যাপারটা করতে গিয়ে রাজু গোলমাল করে আজকের দিনের মতো ক্ষান্ত দেবে। কিন্তু দেখা গেল রাজু কোনো গোলমাল করল না এবং মোটামুটি বেশ ভালো গতিতে রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল।

রাজু প্রায় নেশাগ্রস্তের মতো মোটর-সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল এবং কতক্ষণ এভাবে চলত বলা মুশকিল, কিন্তু ঠিক তখন মামার সাথে কিছু মানুষ দেখা করতে এল। অনেক দূর থেকে এসেছে, মামা তাদের ভিতরে গিয়ে হাতমুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন, তাদের সাথে কথা বলতে হবে, মামার রাজুর দিকে নজর দেবার সময় নেই। রাজু বাধ্য হয়ে মোটর-সাইকেলটা বন্ধ করে তুলে রাখল।

মানুষগুলি গ্রামের মানুষ, অনেকেই লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরে এসেছে। একজন ফুলপ্যান্ট-শার্ট পরে এসেছে, তার চোখে চশমা এবং মুখে গোঁফ আছে, তবুও তাকে দেখে কেমন জানি গ্রামের মানুষ বলে বোঝা যায়। মামা জিজ্ঞেস করলেন, "কী খবর ইদরিস মিয়া?"

ইদরিস মিয়া শুকনো মুখে বলল, "খবর বেশি ভালো না।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"খবিবুর রহমান—"

নামটা শুনেই মামা কেমন জানি শক্ত হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী করেছে খবিবুর রহমান?"

"ফতোয়া দিয়েছে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া হারাম।"

"তাই ফতোয়া দিয়েছে?"

"জি। গ্রামের দুইটা মেয়ের পিঠে দোররা মেরেছে। এখন তার মুরিদেরা লাঠিসোঁটা নিয়ে তৈরি হচ্ছে মেয়েদের স্কুলটা ভেঙে ফেলার জন্যে।"

"স্কুল ভেঙে ফেলবে?"

"জি।"

আজগর মামার মুখ রাগে থমথম করতে লাগল। রাজু এর আগে মামাকে কখনও রাগ হতে দেখেনি। সত্যি কথা বলতে কী, মামা যে রাগ হতে পারেন সেটাই তার জানা ছিল না। দেখল, মামা ভয়ংকর রাগ হতে পারেন, আর মামা যখন রেগে যান তখন তাঁকে দেখে ভয়ে হাত-পা শরীরের মাঝে সেঁধিয়ে যেতে চায়।

মামা কিছু না বলে পাথরের মতো মুখ করে বসে রইলেন। ইদরিস মিয়া খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "আপনার একবার যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন।"

মামা কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর মুখে এবারে চিন্তার একটা ছায়া পড়ল। ইদরিস মিয়া বলল, "আরও ব্যাপার আছে।"

"কী ব্যাপার?"

ইদরিস মিয়া ইতস্তত করে বলল, "এখানে বাচ্চাকাচ্চা আছে, তাদের সামনে বলতে চাই না। যদি যান তা হলে তো শুনবেনই—"

রাজু বুঝতে পারল ইদরিস মিয়া তাদের সামনে বলতে চাইছে না, এখন কি তাদের সামনে থেকে সরে যাওয়া দরকার? সরে যেতে হলে মামা নিশ্চয়ই বলবেন। মামা কিছু বললেন না, তাই রাজুও সরে গেল না।

আজগর মামা উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে এসে ঘরের চৌকাঠ ধরে দূরে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সমস্যা হয়ে গেল ইদরিস মিয়া।"

"কী সমস্যা?"

"এই যে আমার দুইজন ভাগনেকে নিয়ে এসেছি, এদের ফেলে যাই কেমন করে?"

"দুই একদিনের ব্যাপার—"

"একা একা থাকবে এরা?"

"একা কেন? চান মিয়া তো আছে।"

"তা আছে—এখনও এসে পৌঁছায়নি অবিশ্যি।"

ইদরিস মিয়া মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "সে তো এসে পৌঁছে যাবে। আপনি যদি বলেন আমাদের একজন থাকতে পারে এখানে।"

উপস্থিত মানুষেরা জোরে জোরে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। একজন মানুষ বলল, "গ্রামের অবস্থা ভালো না, না হলে তো আমরা সাথেই নিয়ে যেতাম।"

ইদরিস মিয়া বলল, "আপনার ভাগনে তো আমাদেরও ভাগনে।"

আজগর মামা বললেন, "তা ঠিক, কিন্তু এই অবস্থায় এদের গ্রামে নেওয়া ঠিক না।"

সবাই চুপ করে বসে রইল, আর মামা তখন অন্যমনস্কভাবে ঘুরে রাজুর দিকে তাকালেন, তাঁর মুখে একই সাথে একটু দুঃখ আর একটু লজ্জার ভাব। মামা কী বলতে চাইছেন হঠাৎ করে রাজু বুঝে গেল, তাই মামা বলার আগেই সে বলে ফেলল, "মামা, আমরা দুই-একদিন একা একা থাকতে পারব, আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।"

"সত্যি?" মামা উজ্জ্বল চোখে বললেন, "সত্যি পারবি?"

"কেন পারব না? একশোবার পারব।"

সাগর সাধারণত উলটোপালটা কথা বলে, এবারে কী হল কে জানে, সে মাথা নেড়ে বলল, "পারব মামা, কোনো অসুবিধে নেই।"

মামার চেহারায় তবু কেমন জানি একটু অপরাধী-অপরাধী ভাব রয়ে গেল। সেভাবেই বললেন, "চান মিয়া আজ রাতের মাঝে এসে যাবে। সে খুব কাজের মানুষ, একেবারে

নিজের ঘরের মানুষের মতো। সে এসে গেলে তোদের আর কোনো অসুবিধে হবে না, দেখিস কী চমৎকার রান্না করবে!"

রাজুর মামার জন্যে খুব মায়া লাগল, বলল, "তুমি চিন্তা কোরো না মামা, আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। তুমি গিয়ে স্কুলটাকেও বাঁচাও।"

মামা বললেন, "বাঁচাব। দেখিস, স্কুলটাকে ঠিকই বাঁচাব।"

উপস্থিত সব মানুষ তখন জোরে জোরে মাথা নাড়াল। মামা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ড্রয়ারের মাঝে বইয়ের আলমারির চাবি আছে, চান মিয়াকে বলিস, খুলে দেবে।"

"বলব।"

"শেলফের উপর দেখিস একটা বাইনোকুলার আছে, রাত্রিবেলা সেটা দিয়ে আকাশে চাঁদ দেখতে পারবি।"

"ঠিক আছে মামা।"

"গানের ক্যাসেট আছে অনেক। যত জোরে ইচ্ছে গান শুনতে পারিস, আশেপাশে কেউ নেই, কেউ এসে নালিশ করবে না।"

সাগর বলল, "তোমার বন্দুকটা দিয়ে খেলতে পারি মামা?"

মামা চোখ কপালে তুলে বললেন, "কী বললি, বন্দুক?"

"হ্যাঁ।"

"মাথা-খারাপ হয়েছে তোর? বন্দুক কি একটা খেলার জিনিস হল?"

সাগর ভুরু কুঁচকে বলল, "তা হলে রাজু যে মোটর-সাইকেল চালাল?"

মামা মাথা নেড়ে বললেন, "সে তো আমার সামনে চালিয়েছে। আমি না থাকলে রাজুকে মোটর সাইকেল ছুঁতে দেব?"

"দেবে না মামা?"

"না।"

শুনে সাগর খুব খুশি হয়ে দুলে দুলে হাসতে লাগল।

মামা, বললেন, "আমি ঘুরে আসি, তারপর সবরকম অ্যাডভেঞ্চার শুরু হবে। এখন বই পড়িস, গান শুনিস, ইচ্ছে হলে পিছনে পুকুর আছে—যেখানে মাছ ধরতে পারিস। মাঝারি সাইজের রুইমাছ আছে। চান মিয়াকে বলিস ছিপ বের করে দেবে। সাঁতার জানিস তো?"

রাজু মাথা নড়ল, "না মামা।"

মামা চোখ কপালে তুলে বললেন, "তা হলে খবরদার, পুকুরের ধারেকাছে যাবি না। মাছ ধরার দরকার নেই। ঠিক আছে? মনে থাকতে তো?"

মনে থাকবে।

"পিছনে টিলা আছে, সেখানে বেড়াতে যেতে পারিস।"

"ঠিক আছে মামা।"

"আমি দুদিনের মাঝে চলে আসব। চান মিয়ার বাড়ির উপর দিয়ে যাব, সে যদি এর মাঝে রওনা দিয়ে না থাকে তা হলে তাকে পাঠিয়ে দেব। কোনো চিন্তা করিস না।"

মামা খুব তাড়াতাড়ি একটা ব্যাগে দরকারি কিছু জিনিস ভরে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। যাবার আগে রাজুর হাতে বাসার চাবি আর বেশকিছু টাকা দিয়ে গেলেন, যদি হঠাৎ করে কোনো কারণে দরকার হয় সেজন্যে। মামার সাথে আসার সময় আব্বাও

বেশকিছু টাকা দিয়েছেন। সব মিলিয়ে রাজুর কাছে অনেক টাকা, ইচ্ছে করলে মনে হয় একটা ছাগল নাহয় গোরুর বাচ্চা কিনে ফেলতে পারবে।

মামা চলে যাবার পর হঠাৎ মনে হয় সারা বাসাটা বুঝি ফাঁকা হয়ে গেছে। বাসাটা হঠাৎ এত ছমছমে নির্জন হয়ে যায় যে দিনদুপুরে সাগর আর রাজুর কেমন জানি ভয়-ভয় লাগতে থাকে। রাজু অবিশ্যি খুব চেষ্টা করল তার ভয়-ভয় ভাবটা ঢেকে রাখতে। এমনভাবে কথা বলতে লাগল যেন নির্জন একটা বাসায় একা একা থাকাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। দুজনে ঘরের ভিতরে বসে বই পড়ার চেষ্টা করতে থাকে, আর যখনই খুট করে একটা শব্দ হয় তখন দুজনেই একসাথে চমকে ওঠে, তারপর ছুটে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখে চান মিয়া এসেছে কি না।

ঘণ্টাখানেক এভাবে কাটিয়ে দেওয়ার পর রাজু বলল, "চল, বাইরে থেকে ঘুরে আসি।"

সাগর চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে?"

"এই তো এদিকে-সেদিকে।"

"কেন?"

"বসে বসে অপেক্ষা করে করে বিরক্তি লেগে গেছে। বাইরে থেকে ঘুরে এলে সময়টা কাটবে আর খিদেটাও লাগবে ভালো করে। আমরা যখন আসব তখন দেখব চান মিয়া সবকিছু রান্না করে রেখেছে।"

"যদি না করে?"

রাজু রেগে উঠে বলল, "কেন করবে না? মামা তার বাড়ি হয়ে যাচ্ছেন না?"

"যদি বাড়িতে না পান?"

"তা হলে মামা অন্য ব্যবস্থা করবেন।"

সাগর তবু নিশ্চিন্ত হয় না, সবকিছুতে সন্দেহ করা হচ্ছে তার স্বভাব। সাগর অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত বাইরে যেতে রাজি হল, না হয়ে উপায়ও ছিল না, সাগর না গেলে রাজু একা একাই বাইরে বেড়াতে যাবে বলে তাকে জানিয়ে দিল।

বাসার পিছনে বড় বড় গাছ, তার মাঝে দিয়ে ছোট একটা হাঁটাপথ চলে গেছে। পথের দুধারে ঝোপঝাড়, তার মাঝে নানারকম বুনো ফুল ফুটে আছে। হেঁটে হেঁটে তারা একটা বিশাল পুকুরের তীরে হাজির হয়, পুকুরটা ঘিরে নানারকম গাছ, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। পকুরের একদিকে একটা শান-বাঁধানো ঘাট, সেখানে চমৎকার বসার জায়গা। রাজু বলল, "আয় গিয়ে বসি।"

সাগর বলল, "মামা পুকুরে যেতে নিষেধ করেছেন মনে নেই?"

"আমরা পুকুরে যাচ্ছি না, বসার জায়গাটাতেই বসছি।"

সাগর গজগজ করতে লাগল, রাজু সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে শান-বাঁধানো ঘাটে পা ছড়িয়ে বসে। চারিদিকে কেমন জানি সুমসাম নীরবতা। গাছগুলিকে মনে হচ্ছে মানুষ, সবাই যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। রাজু অনেকটা নিজের মনে বলল, "ইশ, কী সুন্দর!"

সাগর এতক্ষণ গজগজ করছিল, এখন হঠাৎ ফোঁশ করে উঠে বলল, "এর মাঝে সুন্দর কী আছে?"

রাজু সাগরের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই সুন্দর কী জানিস না?"

"জানব না কেন?"

"তা হলে এটা সুন্দর লাগছে না?"

"না। সাগর পা দাপিয়ে বলল, আমি এখানে থাকব না।"

রাজুর ইচ্ছে করল সাগরের চুলের মুঠি ধরে তাকে একবার পুকুরের পানি থেকে চুবিয়ে আনে, কিন্তু দুজনে কেউই সাঁতার জানে না—ব্যাপারটা সহজ নয়। সে শুধু চোখ পাকিয়ে সাগরের দিকে তাকাল, দেখল, সাগর ঠোঁট উলটিয়ে কাঁদার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। রাজু উদাস গলায় সাগরের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন খামোকা কাঁদিস না, তোর কান্না শুনে কেউ তোকে দেখতে আসবে না।"

কথাটাতে ম্যাজিকের মতো কাজ হল, মুহূর্তে সাগরের কান্না-কান্না ভাব দূর হয়ে গিয়ে সেখানে ভয়ের একটা ভাব ফুটে ওঠে। ঢোক গিলে শুকনো গলায় বলল, "বাসায় যাব।"

"ঠিক আছে, যাব। একটু বসে যাই, বাসায় গিয়ে তো বসেই থাকবি।"

আশ্চর্য ব্যাপার, সাগর মাথা নেড়ে রাজি হয়ে রাজুর পাশে বসে পড়ে! রাজু তখন হেলান দিয়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। কিছুক্ষণের মাঝেই তার মুখ দেখে মনে হতে থাকে তার পেটব্যাথা করছে।

রাজু আর সাগর যখন বাসায় ফিরে এল তখন বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। এতক্ষণে চান মিয়া নিশ্চয়ই এসে গেছে। তার কাছে রান্নাঘরের চাবি থাকে। সে নিশ্চয়ই এসে এতক্ষণে বেহেশতি পরোটা আর শিককাবাব তৈরি করে ফেলেছে। কিংবা কে জানে হয়তো ভুনা খিচুড়ি। মামা কোনটার কথা বলেছেন কে জানে! সে নাকি খুব ভাল কুলপি বরফ তৈরি করে, আইসক্রিমের মতো খেতে, কে জানে আজকে তৈরি করবে কি না! যদি তৈরি করে তা হলে সে একসাথে দুই বাটি খেয়ে ফেলবে।

আজগর মামার বাসায় এসে পৌঁছানোর আগেই হঠাৎ করে রাজুর দুটি জিনিস মনে হয়, অনেকটা দৈববাণীর মতো। তার মনে হল চান মিয়া এখনও আসেনি এবং চান মিয়া আর আসবে না। কেন এটা তার মনে হল সে জানে না, কিন্তু ব্যাপার দুটি নিয়ে তার মনের ভিতরে আর এতটুকু সন্দেহ রইল না।

কাজেই বাসায় পৌঁছে যখন তারা আবিষ্কার করল পুরো বাসাটিতে থমথমে অন্ধকার এবং রান্নাঘরে তালা ঝুলছে, রাজুও একটুও অবাক হল না। সাগর কিন্তু ব্যাপারটি যেন ঠিক বুঝতে পারল না, কেমন যেন রেগে উঠে বলল, "চান মিয়া এখনও আসেনি?"

রাজু কোনো উত্তর দিল না, হঠাৎ কেন জানি তার একটু ভয়-ভয় লাগতে শুরু করেছে।

"আমরা খাব কেমন করে?"

রাজু এবারেও কোনো উত্তর দিল না, দূরে তাকিয়ে রইল।

"ঘুমাব কেমন করে?"

রাজু তখনও কোনো কথা বলল না, মুখে শুধু চিন্তার একটা ছাপ স্পষ্ট হয়ে এল। ঠিক তখন সাগর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

একেকজন মানুষের কান্নার ধরন একেক রকম, সে-হিসেবে সাগরের কান্নার ধরণটি খুব বিচিত্র। সে প্রথমে হাউমাউ করে একচোট কেঁদে নেয়, তারপর তার কান্নার দমকটা একটু কমে আসে, তখন সে কাঁদতে কাঁদতে নানারকম কথা বলতে শুরু করে। এমনিতে সে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে সে খুব গুছিয়ে সুন্দর করে কথা বলে। মনের ভাবটা সে খুব সুন্দর করে প্রকাশ করে।

রাজু ধৈর্য ধরে সাগরের কান্নার প্রথম পর্ব শেষ হয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে এবং দেখতে দেখতে সেটা শুরু হয়ে গেল। সাগর কাঁদতে কাঁদতে

বলতে শুরু করল যে, আজগর মামার এই বাসাটা একটা জঙ্গল ছাড়া আর কিছু না, তাদের এখানে আসাই ভুল হয়েছে। আজগর মামা তাদেরকে একা একা ফেলে চলে গিয়ে খুব ভুল করেছেন, কারণ, তারা এখন কয়েকদিনের মাঝে না খেয়ে মারা যাবে। একটু স্কুল ভেঙে ফেললে কী হয়—সেটা আবার তৈরি করা যায়, কিন্তু কেউ মরে গেলে তাদেরকে কি আবার বাঁচিয়ে তোলা যায়? যায় না। বন্দুকটা তার ধরা নিষেধ, পুকুরে মাছ ধরতেও যেতে পারবে না। বাসাতে কোনো খেলনা নেই, আলমারিতে যে-বইগুলি আছে তার কোনোটাতে ছবি নেই—সেইসব বই থাকলেই কী আর না থাকলেই কী? এই বাসায় থেকে তাদের কী লাভ? এই মুহূর্তে তাদের আব্বা-আম্মার কাছে চলে যাওয়া উচিত। তাদের যেরকম কপাল, গিয়ে দেখবে আব্বা-আম্মা ঝগড়া করে করে শেষ পর্যন্ত তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তখন তারা কোথায় যাবে? এর থেকে তো মরে যাওয়াই ভালো, তা হলে সে মরে যাচ্ছে না কেন? খোদা কেন শুধুমাত্র কষ্ট দেওয়ার জন্যে তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি....

রাজু প্রথম দিকে সাগরের কান্না আর কথাবার্তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু শেষের দিকে যখন আব্বা-আম্মার কথা বলতে শুরু করল তখন হঠাৎ করে তার নিজেরও মন-খারাপ হয়ে গেল। তখন সে জীবনেও যেটা করেনি সেটা করে ফেলল, সাগরকে ধরে নরম গলায় বলল, "ধুর বোকা ছেলে! কাঁদিস কেন? কাঁদার কী হয়েছে?"

সাগর সাথে সাথে কান্না থামিয়ে অবাক এবং সন্দেহের চোখে রাজুর দিতে তাকাল, রাজু তার সারাজীবনে কয়বার তার সাথে নরম গলায় কথা বলেছে সেটা আঙুলে গুনে ফেলা যায়। সাগর ভুরু কুঁচকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল রাজু সত্যিই তার সাথে নরম গলায় কথা বলছে নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আছে। যখন দেখল অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই তখন সে আরও জোরে ভেউভেউ করে কাঁদতে শুরু করল।

ঠিক কী কারণ বুঝতে পারল না, কিন্তু সাগরের কান্না দেখে রাজুর নিজের চোখেও হঠাৎ পানি এসে গেল। সাবধানে সে চোখ মুছে সাগরের পিঠে হাত রেখে বলল, "কাঁদার কী আছে, দুইদিন একা থাকতে হলে থাকব।"

"খাব কী?"

"আমাদের কাছে টাকা আছে না? বাজারে গিয়ে হোটেলে খাব। হোটেলে মানুষ খায় না?"

সাগর একটু অবাক হয়ে রাজু দিকে তাকাল। রাজু গলার জোর দিয়ে বলল, "বাজার থেকে চাল-ডাল কিনে আনব, তারপর নিজেরা রান্না করে খাব। পিকনিকের মতো হবে।"

"রাত্রে?"

"রাত্রে কী?"

"রাত্রে যদি ভয় লাগে?"

"ভয়?" রাজু অবাক হবার ভান করে বলল, "কিসের ভয়?"

"ভূতের।"

"ধুর!" রাজু হাত দিয়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভান করে বলল, "ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি!"

"যদি রাত্রে ডাকাত আসে?"

"ডাকাত?"

"হ্যাঁ।"

"মামার বন্দুক আছে না? বন্দুক মাথার কাছে রেখে ঘুমাব।"

সাগর চিন্তিত মুখে বলল, "কিন্তু মামা যে বন্দুকটা ধরতে না করেছে?"

"আমরা তো আর ব্যবহার করছি না, শুধু মাথার কাছে রাখছি।"

এই প্রথম সাগরের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। চোখ মুছে বলল, "আমার মাথার কাছে রাখব। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে। রাজু নরম গলায় বলল, "চল, এখন দেখি রান্নাঘরে খাওয়ার কিছু আছে কিনা। যদি থাকে তা হলে আজ রাতে আর বের হব না।"

রান্নাঘরে চাল, ডাল, তেল, মশলা, বাসনকোসন, থালা, চামচ সবকিছু খুঁজে পাওয়া গেল। শুধু তা-ই না, একটা ঝুড়িতে কিছু আলু, কিছু শুকনো ট্যাংরা এবং কয়েকটা মাকারি আকারের ডিমও রয়ে গেছে। একনজর দেখে রাজু হাতে কিল দিয়ে বলল, "চল রান্না করে ফেলি।"

সাগর ভয়ে-ভয়ে বলল, "তুমি রান্না করতে পার?"

"না পারার কী আছে?"

"কী রান্না করবে?"

"খিচুড়ি আর ডিমভাজা।"

সাগর চোখ বড় বড় করে বলল, "তুমি জান খিচুড়ি কেমন করে রান্না করতে হয়?"

"একশো বার জানি। খিচুড়ি রান্না হচ্ছে সবচেয়ে সহজ। চাল ডাল তেল মশলা লবণ সবকিছু মিশিয়ে আগুনে গরম করলে খিচুড়ি হয়ে যায়। যদি ল্যাদলেদে থেকে যায় সেটার নাম হয় নরম খিচুড়ি যদি শুকিয়ে যায় তা হলে বলে ভুনা খিচুড়ি।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, তুই খালি দ্যাখ।"

রাজু সত্যি সত্যি বাসনকোসন টানাটানি করে রান্না শুরু করে দেয়।

রান্নার এই প্রজেক্টটি পুরোপুরি শেষ হতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লেগে গেল। এই সময়ের বেশির ভাগ অবিশ্যি লেগেছে চুলোর আগুন সামলাতে, বাসনকোসন বের করে সেগুলি ধোয়াধুয়ি করতে আর পেঁয়াজ মরিচ কাটাকাটি করতে। রান্নার পর খেতে সময় লাগল খুব কম। রাজু এবং সাগর দুজনেই খুব অবাক হয়ে গেল যখন তারা আবিষ্কার করল তাদের রান্না হয়েছে চমৎকার, তবে আন্দাজ না থাকায় যে-পরিমাণ খিচুড়ি রান্না হয়েছে সেটা হেসে খেলে প্রায় এ-সপ্তাহ খেলেও শেষ হবে বলে মনে হয় না। খিচুড়িতে আরও একটা ছোট রহস্য রয়ে গেছে, এর উপরের ইঞ্চি দুয়েক ভুনা খিচুড়ির মতো হলেও নিচের প্রায় একফুট ল্যাদলেদে রয়ে গেছে। ডিমভাজার মাঝে অবিশ্যি কোনো খুঁত নেই। চোখ বন্ধ করে পাকা বাবুর্চির কাজ হিসাবে চালিয়ে দেওয়া যায়।

খাওয়ার পর দুজনেরই মন একটু ভালো হয়ে যায়। তখন তারা মামার বাসায় কী কী আছে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল। শেলফের উপরে মামার বাইনোকুলারটা পাওয়া গেল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, আকাশে চাঁদও নেই—তাই সেটা দিয়ে কিছু দেখা গেল না। বইয়ের আলমারিতে অনেক বই, তবে বেশির ভাগই পড়ার অযোগ্য—ছোট ছোট ছাপাতে ইংরেজি লেখা। খোঁজাখুঁজি করে কিছু বাচ্চাদের বই পাওয়া গেল, তবে বেশ পুরনো। অনেকগুলি গানের ক্যাসেট, তবে বেশির ভাগই খুব ঢিলে ধরনের গান, খুঁজে খুঁজে কয়েকটা তালের ইংরেজি গান বের করে সেটাই লাগিয়ে দিল। ভলিউম বাড়িয়ে দেবার পর ঘরে বেশ উৎসব-উৎসব ভাব এসে পড়ে। মামার বন্দুকটাও পাওয়া গেল, তবে

সেটা আলমারির মাঝে তালা মারা, আশেপাশে কোনো ছাবিও নেই। যন্ত্রপাতির একটা বড় বাক্সও পাওয়া গেল, তার মাঝে রাজ্যের স্ক্রু নাট বল্টু আর যন্ত্রপাতি।

রাজু আর সাগর দুটা বই নিয়ে এসে বিছানায় হেলান দিয়ে বসে। ঘরে ইংরেজি গান হচ্ছে, কিন্তু দুজনেই কান খাড়া করে রেখেছে হঠাৎ করে যদি চান মিয়া এসে হাজির হয়!

বিছানায় হেলান দিয়ে বসে বই পড়ার একটা ছোট অসুবিধে আছে, সহজেই ঘুম পেয়ে যায়। সাগরের বইটি ছিল একটু নীরস ধরনের, কাজেই প্রথমে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম জিনিসটা বাড়াবাড়ি সংক্রামক, তাই কিছুক্ষণের মাঝে রাজুর চোখের পাতাও ভারী হলে এল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, দুজন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাজু বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নগুলি ঠিক দুঃস্বপ্ন নয়, কিন্তু দুঃস্বপ্নের মতোই। সে দেখল, কারা যেন আম্মা আর আব্বাকে ট্রেনের মাঝে দরজা বন্ধ করে কোথায় জানি নিয়ে যাচ্ছে, রাজু চিৎকার করে ডাকছে, কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না। রাজু চান মিয়াকেও স্বপ্নে দেখল, বসে বসে পরোটা তৈরি করেছে, কিন্তু যতবার পরোটা তৈরি করা হয় ততবার সেগুলি ছোট ছোট জন্তুর মতো ঘরের মাঝে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তারপর সে স্বপ্নে দেখল খবিবুর রহমানকে। বিশাল রামদা হাতে নিয়ে সে লাফঝাঁপ দিচ্ছে। তার মুখে বড় দাড়ি, চোখ লাল আর হাতে বিশাল একটা রামদা। তার সাদা পাঞ্জাবিতে রক্তের ছিটা। সে রামদা হাতে নিয়ে লাফাচ্ছে আর ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েদের দেখলেই তার পিছুপিছু ছুটে যাচ্ছে। একসময় খবিবুর রহমান রাজুকে দেখে ফেলল, তখন রামদা হাতে নিয়ে তার দিকে ছুটে এল, কিন্তু তার কাছে না এসে দরজার চৌকাঠে কোপাতে শুরু করল। খটখট শব্দ হচ্ছে আর সে পান-খাওয়া লাল দাঁত বের করে হাসছে—আর ঠিক তখন ঘুম ভেঙে গেল রাজুর। দেখল সত্যিই দরজায় সাদা পাঞ্জাবি পরা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, মানুষটা নড়ে উঠল আর খটখট করে শব্দ হল চৌকাঠে। ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রাজু, মানুষ নয়, দরজায় পর্দা ঝুলছে, বাতাসে নড়ে উঠে দরজা-জানালা খটখট করে শব্দ করছে।

রাজু বিছানায় পা তুলে বসে রইল। বুকের ভিতর ধকধক করে শব্দ করছে, কী ভয়টাই-না সে পেয়েছিল! সাগর এখনও ঘুমিয়ে আছে, মুখটা একটু খোলা-নিশ্বাসের সাথে সাথে ঠোঁট নড়ছে একটু একটু।

রাজু বিছানা থেকে নেমে এল। দরজা-জানালা বন্ধ করে মশারি টানাতে হবে। খুব বেশি মশা নেই, একটা-দুটা পিনপিন শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তারা বাইরে গিয়ে হয়তো খবর দেবে অন্যদের। রাজু জানালার কাছে দাঁড়ায়, বাইরে অন্ধকার, তার মাঝে দমকা বাতাস। গাছের পাতা নড়ছে, ঝিঁঝি পোকা ডাকছে, হঠাৎ কেন জানি মন-খারাপ হয়ে গেল রাজুর।

জানালা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ রাজু থমকে দাঁড়াল, দূরে টিলার উপর দাউদাউ আগুন জ্বলছে। কী আশ্চর্য, এই গভীর রাতে নির্জন টিলার উপরে আগুন জ্বলছে কেন! কে জ্বালিয়েছে আগুন? রাজুর হঠাৎ কেমন জানি ভয় লাগতে থাকে।

ভালো করে তাকাল সে, অনেক দূরে ভালো করে দেখা যায় না কিছু, মনে হচ্ছে আগুনের সামনে কিছু একটা নড়ছে—কোনো মানুষ আছে ওখানে! কীরকম মানুষ—এত রাতে টিলার উপরে আগুন জ্বালিয়েছে! মামা যে বলেছিলেন নরবলি দেয় তান্ত্রিক সাধুরা সেরকম কোনো মানুষ নাকি? নরবলি কি দিচ্ছে টিলার উপরে?

রাজু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল, আর ঠিক তখন তার বাইনোকুলারটার কথা মনে পড়ল। সে ছুটে গিয়ে শেলফের ওপর থেকে এনে বাইনোকুলারটা চোখে লাগায়, ফোকাস করতেই হঠাৎ আগুনটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, দাউদাউ করে বিশাল একটা আগুন জ্বলছে আর তার সামনে মানুষ নয়, বাচ্চা একটা ছেলে। ঠিক তার বয়সী—ছেলেটার মাথায় লাল একটা ফিতা বাঁধা, খালি গা, হাতে ঢোলের মতো কিছু-একটা জিনিস। আগুনটা ঘিরে ঘিরে সে নাচছে, কিছু-একটা বলছে আর হঠাৎ করে কিছু-একটা ছুড়ে দিচ্ছে আগুনের দিকে—সাথে সাথে দাউদাউ করে আগুনটা বেড়ে যাচ্ছে কয়েক গুণ।

মাথা দুলিয়ে শরীর ঝাঁকিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে ছেলেটা নেচে যাচ্ছে আর নেচে যাচ্ছে, যেন তার উপর কোনো প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে অদৃশ্য জগৎ থেকে। ছেলেটা চিৎকার করছে, কথা বলছে আর আগুনটা বেড়ে যাচ্ছে। মনে হয় কিছুক্ষণেই এই আগুন গ্রাস করে ফেলবে চারদিক।

রাজু হতবাক হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

৪. চতুর্থ দিন

রাজুর রাত্রে ঘুমাতে অনেক দেরি হয়েছিল, সকালে উঠতেও অনেক দেরি হল। ঘুম থেকে উঠে দেখে সাগর বারান্দায় একটা মুড়ির টিন নিয়ে বসে চিবিয়ে চিবিয়ে মুড়ি খাচ্ছে। রাজুকে দেখে বলল, "আমি আর জন্মেও মামার সাথে কথা বলব না।"

"কেন?"

"মামা আমাদের এখানে এনে নিজে চলে গেছে। বলেছে চান মিয়া আসবে, সেও আসেনি। কোনোকিছুর ঠিক নেই মামার—"

রাজু মামার পক্ষ টেনে একটু কথা বলার চেষ্টা করল, "কী করবে মামা, হঠাৎ করে যেতে হল!"

সাগর মুখ শক্ত করে মাথা নাড়ল, "না, মামা খুব ভুল কাজ করেছে। আমি মামাকে সেজন্য শাস্তি দেব, কঠিন শাস্তি।"

"শাস্তি দিবি? তুই?"

"হ্যাঁ।"

"কী শাস্তি দিবি?"

"এখনও ঠিক করিনি, চিন্তা করছি। একটা হতে পারে মামার যত বই আছে সবগুলি ছিঁড়ে ফেলা—"

রাজু চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বলছিস তুই, মাথা-খারাপ হয়েছে?"

সাগর মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, মামার সবগুলি বই যদি ছিঁড়ে ফেলে দিই তা হলে মামার উচিত শাস্তি হবে। তা হলে মামা আর জন্মেও আমাদের ফেলে রেখে চলে যাবে না—"

রাজু একটু এগিয়ে বলল, "দেখ, তুই ওসব কিছু করিস না। মামাকে শাস্তি দিতে চাস ভালো কথা, এমনভাবে দে যেন কোনো ক্ষতি না হয়—"

"সেটা আবার কীরকম?"

রাজু মাথা চুলকে বলল, "যেমন মনে কর মামার তেলের বোতলে কালি ভরে রাখলাম, মামা যেই গোসল করে এসে মাথায় তেল দেবে কালিতে সারা মুখ মাখামাখি হয়ে যাবে—"

ব্যাপারটা চিন্তা করে মুহূর্তে সাগরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দাঁত বের করে হেসে বলল, "হ্যাঁ, তা হলে মামার উচিত শাস্তি হবে। উচিত শাস্তি!"

"তারপর মনে কর মামার যে চিনির বয়াম আছে সেখানে লবণ ভরে রাখলাম। মামা যখন রাত্রে চা বানিয়ে খাবে তখন চা মুখে দিয়েই থু থু করে উঠবে—"

সাগর এবার আনন্দে হেসে ফেলে বলল, "উচিত শাস্তি, উচিত শাস্তি!"

"তারপর মনে কর মামার যে টুথপেস্ট আছে সেটা পিছন থেকে খুলে সব টুথপেস্ট বের করে ভিতরে আমাদের ল্যাদালেদা খিচুড়ি ভরে রাখতে পারি। মামা এসে যেই টুথপেস্ট টিপে ধরবে পিচিক করে হলুদ রঙের খিচুড়ি বের হয়ে আসবে—"

সাগর এবারে হাততালি দিয়ে মাথা নাড়তে থাকে। রাজু বলল, "আগেই বই-টই ছিঁড়িস না।"

রাজু হাতমুখ ধুয়ে এসে সাগরের পাশে বসে মুড়ি খেতে থাকে। মুড়ি জিনিসটা খেতে খারাপ না, কিন্তু এটা কখন খাওয়া বন্ধ করতে হবে বোঝা যায় না। অল্প কিছু মুড়ি নিয়ে বসলে একসময় সেটা শেষ হলে খাওয়া বন্ধ করা যায়। কিন্তু সাগর খুঁজে খুঁজে আস্ত মুড়ির টিন বের করে এনেছে। রাজু মুড়ি খেতে খেতে বলল, "আজকের দিনটা দেখব। যদি মামা না আসে কিংবা চান মিয়া না আসে তা হলে বাসায় চলে যাব।"

সাগর গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ চলে যাব। মামার সবগুলি শাস্তি রেডি করে বাসায় চলে যাব।"

রাজু মুড়ি খেতে খেতে দূরে টিলার দিকে তাকাল—কাল রাতে সেখানে কী ভয়ানক দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল, আর কী আশ্চর্যভাবে একটা ছেলে নেচে যাচ্ছিল। রাত্রিবেলা সেটা দেখে তার কী ভয়টাই না লেগেছিল, অথচ এখন ব্যাপারটাকে মোটেও সেরকম ভয়ের মনে হচ্ছে না, বরং মজার একটা জিনিস বলে মনে হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, জায়গাটা গিয়ে একবার দেখে আসতে ইচ্ছে করছে। রাজু সাগরের দিকে তাকিয়ে বলল, "চল সাগর ঘুরে আসি।"

"কোথায় যাবে?"

"ঐ যে দূরে টিলা দেখা যায় সেখানে।"

"টিলার উপরে?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে উঠবে?"

"হেঁটে হেঁটে, আবার কীভাবে! উড়ে তো আর যেতে পারব না!"

"টিলার উপরে বাঘ-সিংহ নেই তো?"

রাজু হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো ভঙ্গি করে বলল, "আরে গাধা, আজকাল সুন্দরবনেও বাঘ-সিংহ নেই!"

"কোথায় গেছে বাঘ-সিংহ?"

রাজু মুখ ভেংচে বলল, "পিএইচ. ডি. করতে আমেরিকা গেছে। গাধা কোথাকার—এত কথা কিসের! যেতে চাইলে আয়, না হলে থাক।"

"যেতে চাই না। সাগর মুখ বাঁকা করে বলল, তোমার সাথে আমি কোথাও যেতে চাই না।"

রাজু অবিশ্যি সাগরকে একা একা ফেলে রেখে যেতে যাচ্ছিল না, তাই গলা নরম করে বলল, "ঠিক আছে, যদি না যেতে চাস তা হলে একলা একলা থাক এখানে। আর যদি

আমার সাথে যাস তা হলে তোকে বলব কাল রাত্রে তুই যখন ঘুমাচ্ছিলি তখন আমি কী দেখেছিলাম।"

সাথে সাথে সাগর কৌতূহলী হয়ে উঠল, "কী দেখেছিলে?"

"ঐ টিলার উপরে দাউদাউ আগুন আর তার সামনে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হাতে নরমুণ্ড নিয়ে নাচছে।"

"সত্যি?"

"সত্যি। স্পষ্ট দেখা যায়নি, তবু সেরকমই মনে হল। মামার বাইনোকুলার দিয়ে দেখেছি। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অবশ্য সাইজে বেশি বড় না। ছোটখাটো—"

"আমাকে ডাকলে না কেন? আমি দেখতাম—"

"হ্যাঁ! রাজু নাক দিয়ে তাচ্ছিল্যের মতো একটা শব্দ করে বলল, তোকে ডেকে তুলব! তা হলেই হয়েছে! তুই যখন ঘুমাস কার সাধ্যি আছে তোকে ডেকে তোলে! এখন যদি দেখতে চাস তা হলে চল—"

সাগর উৎসাহে উঠে দাঁড়াল, বলল, "চলো যাই। কিন্তু আমাদের কিছু করবে না তো?"

"ধুর! কী করবে? দিনের বেলা ফটফটে আলো, রোদ—এর মাঝে সন্ন্যাসীরা কিছু করে না। সন্ন্যাসীদের সব কাজকারবার রাত্রের অন্ধকারে।"

কিছুক্ষণের মাঝে সাগর আর রাজু মামার বাসার পিছনের মেঠো পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে টিলার দিকে যেতে থাকে। কী সুন্দর একটা দিন, চারিদিক ঝকঝক করছে আয়নার মতো। রোদটা কী চমৎকার! একটুও গরম না, কী সুন্দর মিষ্টি-মিষ্টি ঠাণ্ডা একটা ভাব—এর মাঝে হাঁটলে সারা শরীরে কেমন জানি আরাম লাগতে থাকে। রাজু আর সাগর হেঁটে হেঁটে গাছগাছালির মাঝে দিয়ে ছোট একটা খাল পার হয়ে টিলার উপর উঠতে থাকে। রাজু বাইরে খুব সাহস দেখালেও তার ভিতরে ভিতরে একটু ভয়-ভয় করছিল। কাল রাতের সেই বিচিত্র ছেলেটা যদি এখনও থাকে?

টিলার উপরে উঠে অবিশ্যি রাজুর ভয় কেটে গেল, কেউ কোথাও নেই। উপরে ফাঁকা জায়গাটাতে, যেখানে কাল রাতে আগুন জ্বলছিল—কিছু পোড়া কাঠ আর ছাই পড়ে আছে। চারপাশে গাছগাছালির উপর কেউ-একজন নেচেকুঁদে পুরো জায়গাটাকে সমান করে ফেলেছে। রাজু যখন নিচু হয়ে জায়গাটা ভালো করে দেখার চেষ্টাটা করছিল ঠিক তখন কে যেন চিকন গলায় চিৎকার করে উঠল, "আ-গুন-গুন-গুন- আগুন-গুন..."

রাজু চমকে উঠে দাঁড়াল, সাগর ভয় পেয়ে ছুটে এল রাজুর কাছে, আর ঠিক তখন তাদের ডান পাশ দিয়ে সরসর করে আগুনের একটা হলকা ছুটে গেল। রাজু আর সাগর একসাথে চিৎকার করে উঠে একজন আরেকজনকে ধরে সামনে তাকাল, দেখল ঠিক তাদের সামনে কালোমতন একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় একটা লাল ফিতা বাঁধা। ছেলেটার হাতে পিচকারির মতো কী-একটা জিনিস, আগুনটা সেখানে থেকেই বের হয়েছে।

ছেলেটা তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হেসে আবার চিকন গলায় চিৎকার করে বলল, "খা খা খা, আগুন খইরা খা!"

সাথে সাথে আরেকটা আগুনের হলকা তাদের গা-ঘেঁষে ছুটে গেল। রাজু কী করবে বুঝতে পারছিল না, শক্ত করে সাগরের হাত ধরে রেখে জোর করে গলায় জোর এনে বলল, "কে? কে তুমি? কী চাও?"

ছেলেটা হঠাৎ হিহি করে হাসতে থাকে, যেন খুব মজার একটা ব্যাপার হয়েছে। হাসতে হাসতেই কাছে এসে গলা নামিয়ে বলল, "ভয় পেয়েছ?"

রাজুর বুকের ভিতর তখনও ধকধক করে শব্দ করছে, সাগর তো প্রায় কেঁদেই দিয়েছে। কোনো কথা না বলে রাজু অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল। কালো প্যান্ট আর বোতাম খোলা একটা রংচঙে শার্ট পরে আছে। খালি পা ধুলায় ধূসর,মাথার এলোমেলো চুল একটা লাল কাপড় দিয়ে বাঁধা। ছেলেটা পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, "হঠাৎ দেখে মজা করার শখ হল।"

রাজু কোনো কথা না বলে ছেলেটার দিকে এবং তার হাতের বিচিত্র জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটা রাজুর হতচকিত ভাব দেখে খুব আনন্দ পেল বলে মনে হল। একগাল হেসে বলল, "ভয়ের কিছু নাই। এইটা মজা করার মেশিন। তোমার বাড়ি কই? আগে তো দেখি নাই।"

রাজু শেষ পর্যন্ত কথা বলার মতো একটু জোর পেল, নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি এখানে থাকি না। বেড়াতে এসেছি মামার কাছে।"

"কে তোমার মামা?"

টিলার ওপর থেকে দূরে আজগর মামার ছবির মতো বাসাটা দেখা যাচ্ছিল। রাজু হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ঐ যে আজগর মামার বাসা।"

ছেলেটার চোখগুলি হঠাৎ গোল গোল হয়ে গেল। মুখ দিয়ে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে বলল, "তুমি মাস্টার সাহেবের ভাগনা?"

আজগর মামা কোনো স্কুল-কলেজে পড়ান না, তাঁকে কেন মাস্টার বলছে রাজু বুঝতে পারল না। অন্য কারও সাথে গোলমাল করেছে কি না সন্দেহ হচ্ছিল, কিন্তু ছেলেটার পরের কথা শুনে তার সন্দেহ দূর হয়ে গেল। ছেলেটা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "আজগর স্যার আমাদের সবার মাস্টার সাহেব—একেবারে ফিরিশতা কিসিমের মানুষ। তাঁর ভাগনা তোমরাও তো আধা-ফিরিশতা। তোমাদের ভয় দেখানো ঠিক হয় নাই। একেবারেই ঠিক হয় নাই।"

ছেলেটি এমন গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে লাগল যেন সে ভুল করে কাউকে খুন করে ফেলেছে। রাজু কী বলবে বুঝতে পারছিল না, ছেলেটা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "তোমরা কিছু মনে নাও নাই তো? বুকে হাত দিয়ে বলো।"

বুকে হাত দিয়ে বললে কী হয় রাজু জানে না, কিন্তু তবু সে বুকে হাত দিয়ে বলল, "না, আমি কিছু মনে নিইনি।"

সাগর অবিশ্যি বুকে হাত দিয়ে কিছু বলতে রাজি হল না, উলটো মুখ শক্ত করে বলল, "আমি আজগর মামাকে বলে দেব, তুমি আমাদের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছ—"

ছেলেটা হাহা করে উঠে বলল, "কী বলছ তুমি? আমি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছি? আমি?"

"নয়তো কী? এই যে এটা দিয়ে—"

ছেলেটা সাগরের দিকে হাতের পিচকারির মতো জিনিসটা এগিয়ে দিলে বলল, "দেখো, এইটা শুধু মজা করবার জিনিস।"

"কী এটা?"

"এটার নাম দিয়েছি আগুনি পাখুনি।"

"আগুনি পাখুনি?"

"হ্যাঁ।" ছেলেটা আবার রাজুর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল, "এইটা আমার আবিষ্কার, আগুন পাখির মতো উড়াল দিয়া যায় বলে নাম আগুনি পাখুনি। এই যে পিচকারির এইখানে থাকে পেট্রোল, মুখে সিগারেট-লাইটার। ঠিক পিচকারির সময় সিগারেট-লাইটার ফট করে ধরায়ে দিতে হয়, তা হলে ভক করে আগুন জ্বলে ওঠে। এই যে এইভাবে—" বলে কিছু বোঝার আগেই পিচকারি ঠেলে ধরে লাইটার চাপ দিয়ে ছেলেটা বিশাল একটা আগুনের হলকা তৈরি করে ফেলল। রাজু আর সাগর লাফিয়ে পিছনে সরে এল সাথে সাথে।

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলে, "ভয়ের কিছু নাই। পাতলা পেট্রোলের আগুনে কোনো তাপ নাই।"

রাজু চোখ বড় বড় করে বলল, "তুমি আগুন দিয়ে খেল?"

ছেলেটা আবার দাঁত বের করে হেসে বলল, "খেলি। আমার আসল নাম ছিল তৈয়ব আলি, এখন সেই নামে আমাকে কেউ চেনে না। এখন সবাই আমাকে ডাকে আগুনালি।"

"আগুনালি?"

"হ্যাঁ, আগুন আলি, তাড়াতাড়ি বললে আগুনালি।"

"সবাই জানে তুমি আগুন নিয়ে খেল? কেউ না করে না?"

"আগে করত, এখন বুঝে গেছে না করে লাভ নাই। এখন আর করে না। তা ছাড়া বুঝে গেছে আমি কারও ক্ষতি করি না। আগুন আমার খুব ভালো লাগে। আগুন ছাড়া আমি থাকতে পারি না—" বলেই তার কথাটা প্রমাণ করার জন্যেই সে ধক করে বিশাল একটা আগুনের হলকা উপরে পাঠিয়ে দিল।

সাগর মুখ হাঁ করে আগুনালির দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার ঢোক গিয়ে বলল, "তোমার আগুন ভাল লাগে?"

"রসগোল্লার মতো।"

"কাল রাত্রে তুমি এখানে আগুন জ্বালিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, তোমরা দেখেছিলে?"

সাগর মাথা নাড়ল, "না, আমি দেখিনি, ভাইয়া দেখেছিল।

আগুনালি উজ্জ্বল মুখে বলল, "ফার্স্ট ক্লাস একটা আগুন হয়েছিল। শুকনা কাঠ, কড়কড় করে পোড়ে, শোঁ-শোঁ করে উপরে ওঠে—কী তেজ আগুনে! কিন্তু কোনো উলটাপালটা কাজ নাই। আমার তো দেখে নাচার ইচ্ছা করছিল।"

রাজু মাথা নাড়ল, "আমি দেখেছি, তুমি নাচছিলে।"

ছেলেটা একটু লজ্জা পেয়ে গেল। থতমত খেয়ে বলল, "তুমি কেমন করে দেখেছ?"

"বাইনোকুলার দিয়ে।"

"ও! দূরবিন দিয়া? মাস্টার সাহেবের দূরবিন?"

"হ্যাঁ। তুমি যে এত বড় আগুন করেছিলে, যদি সারা পাহাড়ে সেই আগুন ছড়িয়ে যেত?"

আগুনালি বুকে থাবা দিয়ে বলল, "আমি যেরকম আগুনকে ভালোবাসি আগুনও আমাকে সেইরকম ভালোবাসে। আগুন আমার কথা ছাড়া এক পা নড়ে না।"

"আগুন এক পা নড়ে না?"

"না। এক ড্রাম পেট্রোল রাখো, তার এক হাত দূরে আমি দুই-মানুষ সমান উঁচু আগুন করে দেব, আগুন পেট্রোলকে ছোঁবে না।"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "কেমন করে সেটা করবে?"

"আগুনকে বুঝতে হয়। যখন ভালো করে আগুন ধরে তখন গরম বাতাস ওপরে ওঠে। তখন চারপাশ থেকে বাতাস আসে, সেই বাতাসে আগুন নড়েচড়ে। সেই বাতাস দিয়ে বোঝা যায় আগুন কোন দিকে যাবে। তখন ইচ্ছা করলে আগুনকে কন্ট্রোল করা যায়।"

"তুমি কন্ট্রোল করতে পার?"

"পারি।" কথা বলতে বলতে আগুনালি অন্যমনস্কভাবে পকেট থেকে একটা ম্যাচ বের করে একসাথে চারটা ম্যাচের কাঠি দিয়ে ফস করে আগুন ধরিয়ে সেটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "আমি আগুন কন্ট্রোল করতে পারি। আজকাল এই এলাকায় যখন আগুন লাগে তখন দমকল বাহিনীকে খবর পাঠাবার আগে আমাকে খবর পাঠায়। দমকল বাহিনী যাবার আগে হাজির হয় এই আগুনালি!"

"তুমি গিয়ে কী কর?"

"আগুনের সাথে কথা বলি।"

"ধুর! আগুনের সাথে আবার কথা বলে কেমন করে?"

আগুনালি আবার দাঁত বের করে হেসে বলল, "সেটা তোমরা বুঝবা না। আলাউদ্দিন ব্যাপারি পাটের গুদামে যখন আগুন লেগেছিল তখন আমাকে ডাকল। গিয়ে দেখি উলটা জায়গায় পানি দিচ্ছে। আমি বললাম, কোনো লাভ নাই, আগুনের তেজ অনেক বেশি- দক্ষিণ দিক বাঁচাতে পারবা না। একটু পরেই পিছন-ঝাপটা দেবে, ভুস করে আগুন আকাশে উঠে যাবে। দেখবে তখন আগুন কতদূর যায়! উত্তর দিকে পানি দাও, অন্তত দুইটা গুদাম বাঁচবে। আমার কথা শুনল না, তিনটা গুদাম পুড়ে শেষ।"

কথা বলতে বলতে আগুনালি মুখে লোল টেনে বলল, "আহ্, কী একটা আগুন! লকলক করে উপরে উঠছে, ঠাস-ঠাস করে ফুটছে, দাউদাউ করে জ্বলছে আর শাঁই-শাঁই করে বাতাস—কী দৃশ্য! আহ্!"

রাজু আর সাগর অবাক হয়ে আগুনালির দিকে তাকিয়ে ছিল। আগুনালি হঠাৎ একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "এখন তোমাদের কথা বলো। কয়দিন থাকবে এখানে?"

রাজু সাগরের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "মনে হয় আজকেই চলে যাব।"

"আজকেই চলে যাবে? কেন? থাকো কয়দিন।"

"নাহ্!"

"কেন? আমাদের জায়গা ভালো লাগে না তোমাদের?"

"ভালো লাগে। ভালো লাগবে না কেন?"

"তা হলে?"

"আসলে আজগর মামা কয়দিনের জন্যে বাইরে গেছেন। চান মিয়াও নেই। খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট।"

"খাওয়ার কষ্ট? হোটেলে খাও না কেন?"

"হোটেলে?"

"হ্যাঁ, আমার সাথে ইন্সিশাল খাতির, আমি বললেই দেখবা এই বড় বড় গোশতের টুকরা দেবে।"

শুধু খাওয়ার কষ্ট না—রাজু মাথা নেড়ে বলল, "অন্য ঝামেলাও আছে।"

"কী ঝামেলা?

"মামার এত বড় বাসা, একলা একলা থাকতে ভয় করে।"

"কিসের ভয়?"

রাজু কিছু বলার আগেই সাগর বলল, "ভূতের।"

রাজু ভেবেছিল সাগরের কথা শুনে আগুনালি হো হো করে হেসে উঠবে, কিন্তু আগুনালি একটুও হাসল না, বরং মুখটা খুব গম্ভীর করে ফেলে বলল, "তা ঠিক, পাহাড়ি জায়গায় ভূতপ্রেতের বড় ঝামেলা। তালতলার পীর এক নম্বর তাবিজ দেন, জিন-ভূতের আবার সাধ্য নাই কাছে আসে। কিন্তু একটা সমস্যা—"

"কী সমস্যা?"

"পীর সাহেব বাচ্চা পেলাপান দেখলে খুব রাগ করেন। শরিফুদ্দি গিয়েছিল গতবার, খড়ম ছুড়ে মারলেন। চানদিতে লেগে একেবারে ফাটাফাটি অবস্থা! বড় কাউকে নিয়ে যেতে হবে।" আগুনালি চোখ ছোট ছোট করে চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্কভাবে বলল, "একটা উপায় অবশ্যি আছে।"

"কী উপায়?"

"গফুরের একটা তাবিজ আছে—ভাড়া দেয়। ভাড়া নিয়ে আসা যায়। আমি বললে মনে হয় বেশি দরদাম করবে না।"

রাজু অবাক হয়ে আগুনালির দিকে তাকিয়ে রইল। তার বয়সী একটা ছেলে তাবিজ ঝাড়ফুঁক বিশ্বাস করে, সেই ব্যাপারটাই তার বিশ্বাস হচ্ছে না—এখন সে তাবিজ ভাড়া করার কথা বলছে! তার হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল, কিন্তু সে হাসল না। মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমি তাবিজ বিশ্বাস করি না।"

আগুনালি চোখ কপালে তুলে বলল, "বিশ্বাস কর না?"

"না।"

"আমার আপন ফুপাতো বোন, আপন ফুপাতো বোন—"বেশি উত্তেজনায় কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ আগুনালির মুখে কথা আটকে গেল। কয়েকবার চেষ্টা করে হঠাৎ হাল ছেড়ে দিয়ে পাথরের মতো মুখ করে বলল, "তার মানে তুমি বলতে চাও যে তুমি ভূতও বিশ্বাস কর না?"

রাজু মাথা নাড়ল, "না।"

আগুনালির পাথরের মতো শক্ত মুখ এবার আষাঢ়ের মেঘের মতো কালো হয়ে থমথম করতে লাগল। সে আবার অন্যমনস্কের মতো পকেট থেকে একটা ম্যাচ বের করে এবারে একসাথে ছয়টা কাঠি নিয়ে ফস করে আগুন ধরিয়ে নিয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে রইল, আগুনটা জ্বলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে কাঠিগুলি ধরে রেখে যখন আঙুলে ছ্যাঁকা লাগার অবস্থা হল তখন দূরে ছুড়ে ফেলল। তারপর মুখ তুলে রাজুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এক লাখ টাকা।"

"এক লাখ টাকা কী?"

"এক লাখ টাকা বাজি।"

"কিসের জন্য?"

"ভূতের জন্য।"

"ভূতের জন্য?"

"হ্যাঁ।"

রাজু ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারল না, "বলল, ভূতের জন্য বাজি মানে কী?"

"আমি তোমাকে ভূত দেখাব।"

"দেখাতে না পারলে তুমি আমাকে এক লাখ টাকা দেবে?"

"হ্যাঁ, আর দেখাতে পারলে তোমার আমাকে এক লাখ টাকা দিতে হবে।"

রাজু মাথা নাড়ল, "আমার এক লাখ টাকা নেই, কোনোদিন হবেও না।"

"আমারও নাই এক লাখ টাকা।" আগুনালি বাজির দর কমিয়ে আনে, "দশ টাকা বাজি।"

"এক লাখ থেকে একবারে দশ?"

আগুনালি বিরক্ত হয়ে বলল, "টাকাটা তো আর বড় কথা না—বড় কথা হচ্ছে মুখের জবান।"

"তুমি জবান দিচ্ছ যে তুমি আমাকে ভূত দেখাবে?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি নিজে দেখেছ ভূত?"

আগুনালি বুকে থাবা দিয়ে বলল, "এই বান্দা কোনো জিনিস নিজে না দেখে মুখ খোলে না।"

"কীরকম দেখতে?"

"যখন দেখবে তখন জানবে। এই বান্দা আগে থেকে কোনো জিনিস বলে না।"

"কোথায় ভূতটা?"

আগুনালি আবার বুকে থাবা দিয়ে বলল, "এই বান্দা আগে থেকে কিছু বলবে না।"

সাগর খুব অবাক হয়ে দুজনের কথাবার্তা শুনছিল, এবার গলা বাড়িয়ে বলল, "তুমি কি ভূতটা ধরে একটা শিশিতে ভরে দিতে পারবে?"

আগুনালি খানিকক্ষণ হাঁ করে সাগরের দিকে তাকিয়ে রইল, রাজুর মনে হল রেগে-মেগে কিছু একটা বলবে, কিন্তু কিছু বলল না। যখন সাগর তার অভ্যাসমতো আবার জিজ্ঞেস করল, তখন মাথা নেড়ে বলল, "না, আমি পারব না।"

"কেন পারবে না? তুমি যদি দেখতে পার তা হলে কেন ধরতে পারবে না?"

"একটা জিনিস দেখা গেলেই সেটা ধরা যায় না। মাছি তো দেখছ, কোনোদিন একটা মাছি ধরতে পেরেছ?"

সাগর এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "কিন্তু মশা ধরেছি। মশা ধরা তো অনেক সোজা।"

"ভূত আর মশা এক জিনিস না—"আগুনালি সাগরের সাথে কথায় বেশি সুবিধে করতে পারছিল না বলে রাজুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন বলো ভূত দেখতে চাও কি না।"

রাজু মাথা চুলকে বলল, "কিন্তু ভাবছিলাম বাসায় ফিরে যাব।"

সাগর মাথা নাড়ল, "না ভাইয়া, চলো ভূতটা দেখে যাই। যদি ধরতে পারি তা হলে আরও মজা হবে।"

আগুনালি বলল, "শুধু ভূত! এখানে কত কী দেখার আছে, দুই মাথাওয়ালা গরু, মাকড়শা কন্যা, মাটির নিচের গুহা, ঝুলন্ত ব্রিজ, নরবলি মন্দির, মৌনি সাধু—"

"কোথায় সেগুলি?"

"এই তো আশেপাশে। কত দূর দূর থেকে লোকজন দেখতে আসে, আর তুমি এখানে থেকেও না দেখে চলে যেতে চাও? থেকে যাও, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।"

রাজু আগুনালির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু সবার আগে দেখাবে ভূত।"

আগুনালি আবার দাঁত বের করে হাসল, হয় তার দাঁত বেশি, নাহয় অল্পতেই দাঁত বের হয়ে যায়—কিন্তু ছেলেটা মজার তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল আগুনালির সাথে রাজু আর সাগর বের হয়েছে। প্রথমে দেখতে যাবে দুই মাথাওয়ালা গোরু। জায়গাটা বেশ দূর। প্রথমে খানিকটা জায়গা রিকশা করে যেতে হয়। রিকশা থেকে নেমে বাকি রাস্তা হেঁটে। গ্রামের সড়ক, দুপাশে ধানক্ষেত আর গ্রাম দেখতে ভারি সুন্দর দেখায়। সড়কের মাঝে নরম একধরনের ধুলা, পা ফেললে গেঁথে যায়, ভারি আরাম লাগে তখন। রাজুর ধারণা ছিল সাগর একটু পরেই মেজাজ খারাপ করে কান্নাকাটি শুরু করে দেবে, কিন্তু দেখা গেল তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। রাস্তায় দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে, পাশে কোপঝাড় থেকে ফুল তুলে আনছে, পানিতে ঢিল ছুড়ছে। এক জায়গায় কোপঝাড় স্বর্ণলতায় ঢেকে আছে, সেটা খুব কৌতূহল নিয়ে দেখল। আগুনালি স্বর্ণলতা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তাকে একটা চশমা তৈরি করে দিল, সেই চশমা পেয়ে তার আনন্দ দেখে কে! তিনজন তিনটা চশমা পরে হেঁটে যেতে যেতে হেসে কুটিকুটি হয়ে যাচ্ছিল।

দুই মাথাওয়ালার গোরুর জায়গাটা খুঁজে বের করতে বেশি অসুবিধে হল না, আগুনালি আগে এসেছে। একটা গৃহস্থের বাড়ি, বাসার সামনে গাছ, সেই গাছে একটা সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ডে খুব কাঁচা হাতে দুই মাথাওয়ালা একটা গোরুর ছবি আঁকা, তার পাশে গোরুর বৃত্তান্ত। এই গোরুর নাকি আল্লার বিশেষ কুদরত এবং এর সাথে শরীর ঘষে দিলেই নাকি বাতের ব্যথা উপশম হয়। এর গোবর পেটে লেপে দিলে গর্ভবতী মহিলাদের প্রসববেদনা ছাড়া বাচ্চা হয়, এর পেশাব মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে নাকি কালাজ্বর এবং ম্যালেরিয়া রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। সাইবোর্ডের নিচে বিভিন্ন রকম মূল্য-তালিকা রয়েছে। বাসার সামনে মানুষজনের ভিড়—সবার হাতে শিশি নাহয় কৌটা রয়েছে, মনে হচ্ছে গোরুর গোবর এবং পেশাব কিনতে এসেছে। এইরকম একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে নিজের চোখে না দেখলে রাজু বিশ্বাস করত কি না সন্দেহ।

এক টাকা করে টিকেট কিনে তারা একটা চালাঘরে ঢুকল। ঘরের ভিতরে আবছা অন্ধকার, তার মাঝে আগরবাতি জ্বলছে। ঘরের মেঝেতে একটা কাঁথা বিছানো, সেখানে একটা গোরু দাঁড়িয়ে আছে। গোরুর গলার এক পাশে টিউমারের মতো একটা জিনিস বের হয়ে আছে। সেখানে কাঁচা হাতে চুন এবং আলকাতরা দিয়ে দুটো চোখ আঁকা হয়েছে। হঠাৎ দেখলে একটু চমকে উঠতে হয়, কিন্তু সেটি যে সত্যিকারের মাথা নয় সেটি বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। উপস্থিত লোকজন কিছু কেউ সেটা নিয়ে একটা কথাও বলছে না। গোরুর কাছে চাপদাড়িওলা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, সে এই গোরুর জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে একটা বড় বক্তৃতা দিল—বক্তৃতার মাঝেই হঠাৎ গোরুর বাথরুম করার প্রয়োজন হল, মানুষটি তখন বক্তৃতা বন্ধ করে এক ছুটে একটা বালতি এনে সেটাতে গোরুর মূল্যবান গোবরটাকে রক্ষা করে ফেলল। পুরো ব্যাপারটা এত বিচিত্র যে রাজু হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর কয়েকজন বুড়ো মানুষ শার্ট গেঞ্জি খুলে খালি গা হয়ে গোরুর সাথে শরীর ঘষে নিল, তাদের মুখ দেখে সত্যিই মনে হল তাদের বাতের ব্যথা বুঝি পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছে।

রাজু আগুননালিতে খোঁচা দিয়ে বলল, "চলো যাই।"

"আর দেখবে না?"

"না।"

সাগর বের হওয়ার সময় চাপদাড়িওয়ালা মানুষটাকে গোরুর দুই নম্বর মাথাটা দেখিয়ে বলল, "এইটা তো সত্যিকার মাথা নয়—"

সাগরের কথা শুনে চাপদাড়িওয়ালা মানুষটা একেবারে থতমত খেয়ে যায়। কী-একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আগুনালি সাগরের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে চালাঘর থেকে বের করে আনে।

বাইরে বের হয়ে সাগর বলল, "কালি দিয়ে চোখ এঁকেছে! নকল মাথা!"

বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের যে-কয়জন সাগরের কথা শুনতে পারল সবাই মাথা ঘুরিয়ে সাগরের দিকে চোখ-গরম করে তাকাল। আগুনালি মানুষগুলি দিকে তাকিয়ে কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গি করে বলল, "ছোট পোলাপান তো, কী বলতে কী বলে তার ঠিক নাই—"

তারপর সাগর আর রাজুকে নিয়ে সড়ক ধরে হাঁটতে শুরু করে। বেশ খানিক যাবার পর রাজু বলল, "তোমার ভূত কি এইরকম দুই মাথাওয়ালা গোরুর মতো?"

"মানে?"

"এইরকম ফাঁকিবাজি?"

"এটা ফাঁকিবাজি ছিল?"

"ফাঁকিবাজি নয়তো কী! আলকাতরা দিয়ে চোখ এঁকে রেখেছে।"

"তা হলে মানুষ আসছে কেন দেখতে?"

"মানুষ না জেনে আসছে।"

আগুনালি কোনো কথা না বলে খামোকাই তার পিচকারিটা হাতে নিয়ে আকাশের দিকে একটা আগুনের হলকা পাঠিয়ে দিল-বোঝা গেল সে একটু রেগে গেছে।

হেঁটে এবং রিকশা করে তারা যখন ফিরে এল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বাজারের কাছে একটা হোটেলের সামনে তারা রিকশা থামিয়ে নেমে গেল। আগুনালি বলল, এটা নাকি তার পরিচিত হোটেল। ভিতরের দিকে একটা খালি টেবিলে বসে আগুনালি হাঁক দিল, "কাউলা ভাই, এই টেবিলটা ভালো করে মুছে দেন, এরা মাস্টার সাহেবের ভাগনা।"

আগুনালির খাতিরেই হোক আর আজগর মামার ভাগনে বলেই হোক, কাউলা নামের মানুষটা টেবিল মুছে ধোয়া গ্লাসে পানি এনে দিল। আগুনালি জানতে চাইল খাবার কী আছে। কাউলা নামের মানুষটা যন্ত্রের মতো কী কী মাছ-তরকারি আছে বলে গেল। তার মাঝে কী কী খাওয়া যায় সেটা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত খাবার অর্ডার দেওয়া হল।

কিছুক্ষণের মাঝেই খাবার চলে এল। থালাবাসন সবই খুব পরিষ্কার, মাছ-তরকারি দেখতেও খুব সুন্দর লাগছে, কিন্তু খেতে গিয়ে দেখা গেল খুব ঝাল। রাজু তবু কষ্ট করে খেয়ে নিচ্ছিল। সাগরের খুব ঝামেলা হল, চোখে-নাকে পানি এসে যাচ্ছিল। আগুনালি তখন সাগরের মাছ-তরকারি ডালের মাঝে ধুয়ে দিল, এবং সত্যি সত্যি তখন ঝাল কমে গিয়ে মোটামুটিভাবে খাবারের মতো অবস্থায় এসে গেল।

আগুনালি খুব কাজের মানুষ, খাওয়াদাওয়ার পর হোটেলে ম্যানেজারের সাথে কথা বলে ব্যবস্থা করে নিল, প্রত্যেকদিন দুপুরে আর রাত্রে আজগর মামার বাসায় খাবার পৌঁছে

দেবে। আগে থেকে কিছু টাকা দিতে হবে কি না রাজু জিজ্ঞেস করতে চাইছিল, ম্যানেজার সাথে সাথে জিবে কামড় দিয়ে বলল, "মাস্টার সাহেবের বাসায় খাবার পাঠাব, তার জন্য অ্যাডভান্স নিলে সোজেথেও জায়গা হবে না।"

আজগর মামা ঠিক কী করেন কে জানে, কিন্তু এই এলাকার মানুষজন তাঁকে সত্যি সত্যি ফিরিশতার মতো মনে করে।

হোটেল থেকে বের হয়ে বাজারটা ওরা একটু ঘুরে দেখল। ছোট ছোট নানারকম দোকানপাট আছে, তার মাঝে নানা ধরনের জিনিসপত্র। একপাশে কিছু বেদেনি চুড়ি নিয়ে বসেছে, অন্য পাশে মাটির খেলনা, শোলার পাখি। সাগর একটা শোলার পাখি এবং গলায় স্প্রিং লাগানো মাটির রবীন্দ্রনাথ কিনল, রবীন্দ্রনাথের মাথায় ঠোকা দিলেই তিনি মাথা নাড়তে থাকেন। আব্বা আর আম্মা দুজনেই রবীন্দ্রনাথের এত বড় ভক্ত যে তাঁরা এটা দেখলে মনে হয় চটে যেতে পারেন।

রাজু আর সাগরকে আগুনালি যখন বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল তখন বিকেল হয়ে গেছে। আগুনালি আর বসল না, সাথে সাথেই চলে গেল, রাত্রিবেলা আবার আসবে ভূত দেখাতে নেওয়ার জন্য। বাসা ওরা যেভাবে তালা মেরে রেখেছিল ঠিক সেভাবেই আছে, চান মিয়ার এখনও দেখা নেই। রাজু অবিশ্যি সেটা নিয়ে ঘাবড়ে গেল না, এখন মনে হচ্ছে চান মিয়াকে ছাড়াই তারা কয়েকদিন চালিয়ে নিতে পারবে।

সারাদিন হেঁটে হেঁটে ওরা খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছে। সাগর শোলার পাখিটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ খেলে সোফায় বসে বসেই হঠাৎ ঘুমিয়ে গেল। ঘুম জিনিসটা মনে হয় সংক্রামক, তাই রাজু ঘুমাবে না ঘুমাবে না করেও শেষ পর্যন্ত চোখ খোলা রাখতে পারল না। সাগরের দেখাদেখি সেও একটা সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অসময়ে অজায়গায় ঘুমিয়ে গেলে সাধারণত বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখা যায়, রাজু সেটা হাড়েহাড়ে টের পেল। সোফায় শুয়ে শুয়ে এমন সব স্বপ্ন দেখতে লাগল যে বলার নয়! স্বপ্নে দেখল দুই মাথাওয়ালা গোরু শিং উঁচিয়ে তাদের তাড়া করে আসছে, রাজু প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছে। তখন হঠাৎ গোরুটা মুখ হাঁ করে বিদঘুটে একটা আওয়াজ করল—সাথে সাথে গোরুর মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বের হয়ে এল। তখন হঠাৎ আগুনালিকেও দেখা গেল, সে তার আগুনের পিচকারি নিয়ে হাজির হয়ে দুই মাথাওয়ালা গোরুর সাথে যুদ্ধ করতে শুরু করেছে। ঠিক তখন তার আগুনের পিচকারি থেকে আগুন বের না হয়ে ঝাল মাছের ঝোল বের হতে শুরু করেছে—স্বপ্নে সেটাও খুব বিচিত্র মনে হচ্ছে না, তাই নিয়েই আগুনালি যুদ্ধ করছে। ওদেরকে ঘিরে লোকজনের ভিড় জমে গেছে আর তাদের চ্যাঁচামেচিতে রাজুর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে উঠে দেখে হোটেল থেকে একটা ছেলে খাবার নিয়ে এসে ডাকাডাকি করছে। ছেলেটা ছোট, সে প্রায় তার সমান-সমান একটা টিফিন-ক্যারিয়ার ভরে খাবার নিয়ে এসেছে। রাজু রান্নাঘরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে কিছু বাসনপত্র বের করে সেখানে খাবার ঢেলে রাখল।

ছেলেটা চলে যাবার পর রাজু খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। অসময়ে ঘুমিয়েছে বলে মনটা কেমন জানি ভালো লাগছে না, শুধু আম্মা-আব্বার কথা মনে হচ্ছে। চুপচাপ খানিকক্ষণ মন-খারাপ করে বসে থেকে সে সাগরকে ডেকে তুলল। ঘুমের মাঝে ওলটপালট করে তার শোলার পাখিটা ভেঙেচুরে গেছে, ঘুম থেকে উঠে সে সেটা নিয়ে খানিকক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করল। কিন্তু নিজেই ভেঙেছে, বলার কিছু নেই। তার উপর কদিন থেকে কান্নাকাটি করে খুব সুবিধে করতে পারছে না, কেউ শোনার নেই, তাই খামোকা আর কাঁদল না।

দুজনে হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে খেতে বসল। আগুনালি হোটেলের ম্যানেজারকে অনেকবার বলে দিয়েছিল যেন ঝাল কম করে দেয়, কিন্তু তবু লাভ হয়নি। সবকিছুতেই আগুনের মতো ঝাল।

আগুনালির শিখিয়ে দেওয়া কায়দায় সবকিছু ডালের মাঝে ধুয়ে নেওয়ার পর তারা মোটামুটি শখ করেই খাওয়া শেষ করল। যে-পরিমাণ খাবার এনেছে সেটা দুজনেই শেষ করার মতো নয়, খাবার বেশির ভাগই পড়ে রইল বাটিতে।

খাওয়া শেষ করে রাজু আর সাগর জুতো-মোজা পরে আগুনালির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। দিনের বেলা ভূত দেখার ব্যাপারটা নিয়ে হাসি-তামাশা করেছে, পুরোটাই একটা মজার জিনিস বলে মনে হয়েছে। কিন্তু রাত্রিবেলা যখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, এমনিতেই একটা গা-ছমছমানি ভাব—তখন হঠাৎ করে ভূত দেখতে পাওয়ার ব্যাপারটা থেকে মজার অংশটুকু উধাও হয়ে গিয়ে সেটাকে ভয়ের জিনিস মনে হতে শুরু করেছে।

আগুনালি এসে পৌঁছাল বেশ রাতে। তার সাথে পিচকারির মতো জিনিসটা নেই, হাতে ছোট ছোট দুটো বাঁশের কঞ্চি। রাজু জিজ্ঞেস করল, "এই কঞ্চি দিয়ে কী করবে?"

"তোমাদের জন্যে।"

"আমাদের জন্যে?"

"হ্যাঁ। তোমাদের তো জিন-ভূতের তাবিজ নাই সেইজন্যে। বাঁশের কঞ্চি একটু পুড়িয়ে নিয়ে সাথে রাখলে জিন-ভূত আসে না।"

দিনের বেলা হলে রাজু পুরো ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দিত, কিন্তু এই রাত্রিবেলা সেটা নিয়ে সে হাসাহাসি করল না। কঞ্চি দুটো নিয়ে নিজেদের পকেটে রেখে দিল।

যখন রাজু আর সাগর আগুনালির সাথে বের হল তখন রাত সাড়ে দশটা। ঘর থেকে বের হতেই মনে হল চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাজুর হাতে মামার বড় টর্চলাইটটা ছিল, সেটা জ্বালাতেই আগুনালি বলল, "লাইট জ্বালিও না।"

"কেন?"

"সাথে আলো থাকলে ভূত আসে না। তা ছাড়া আলো না জ্বালালে চোখে আস্তে আস্তে অন্ধকার সয়ে যায়, তখন অন্ধকারেই সব স্পষ্ট দেখা যায়।"

রাজু প্রথম আগুনালির কথা বিশ্বাস করেনি, কিন্তু একটু পরেই দেখল তার কথা সত্যি। প্রথম যখন ঘর থেকে বের হয়েছিল মনে হচ্ছিল চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার—এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কিছুক্ষণেই চারপাশের সবকিছু বেশ স্পষ্ট হয়ে এল। রাস্তা, রাস্তার পাশে গাছপালা—সবকিছু আবছাভাবে বোঝা যায়। আকাশে ছোট একটা চাঁদ, সেটা থেকে অল্প একটু আলো ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু সেই অল্প আলোতেই যে এত কিছু দেখা সম্ভব কে জানত!

হাঁটতে হাঁটতে রাজু জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? কারও বাড়িতে?"

আগুনালি মাথা নাড়ল, "না, ঠিক বাড়িতে না।"

"তা হলে কি শ্মশানে?"

"না। ঐসব জায়গায় যাওয়া ঠিক না। খারাপ রকমের জিনিস থাকে। তাবিজেও কাজ হয় না।"

"তা হলে কোথায়?"

"এই এলাকায় একটা বড় বাড়ি ছিল। নাম ছিল নাহার মঞ্জিল। বড় বাড়ি, বিশাল এলাকা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সেই বাড়িতে থাকত কাশেম আলি চৌধুরী। বড় রাজাকার ছিল কাশেম আলি। এই এলাকায় যখন পাকিস্তানি মিলিটারি আসত তার বাড়িতে ঘাঁটি করত। মানুষজনকে ধরে নিত তার বাড়িতে, অত্যাচার করে গুলি করে মারত তাদেরকে। অনেক মেয়েকেও মেরেছে—অনেকে নিজের গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে।"

"কেউ কিছু বলেনি?"

"যুদ্ধের সময় ভয়ে কিছু বলে নাই। যখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে তখন এলাকার মানুষেরা পুরো বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে।"

"আর কাশেম আলি?"

"সেই ব্যাটা পাকিস্তানে পালিয়ে গেছে। তাকে ধরতে পারে নাই। ধরতে পারলে জ্যান্ত তার চামড়া ছিলে ফেলত।"

"এখন তো সব রাজাকার পাকিস্তান থেকে ফেরত আসছে, সেই ব্যাটা ফিরে আসেনি?"

"জানি না। যা-ই হোক, সেই নাহার মঞ্জিল এখন ভেঙেচুরে পড়ে আছে—বলতে গেলে ভূতের বাড়ি। সেই বাড়িতে এত মানুষ মেরেছে যে জায়গাটা আর ঠিক হয় নাই। রাত গভীর হলেই নানারকম চিৎকার শোনা যায়। মানুষজন এদিক দিয়ে গেলে অনেক কিছু দেখে—"

"অনেক কিছু কী?"

"এখন বলতে চাই না। শুনলে তোমরা ভয় পাবে।"

না শুনেই হঠাৎ রাজুর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সাগর ভয় পেল আরও বেশি, হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, "আমি যেতে চাই না। বাসায় যাব।"

রাজু বলল, "ধুর বোকা! ভয়ের কী আছে?"

আগুনালি বলল, "ভয়ের কিছু নাই, আমরা তো আর নাহার মঞ্জিলের ভিতরে ঢুকব না। দূর থেকে দেখব।"

"দূর থেকে?"

"হ্যাঁ, অনেক দূর থেকে।"

"যখন রাত হবে তখন কথা শুনতে পারবে, ছায়ার মতো জিনিস দেখবে—"

সাগর আবার দাঁড়িয়ে গেল, ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "যেতে চাই না আমি।"

এতদূর এসে ফিরে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। রাজু সাগরকে বুঝিয়ে রাজি করাল, কানে-কানে বলল, "আমার কাছে টর্চলাইট রয়েছে না? জ্বালিয়ে দেব, সাথে সাথে সব চলে যাবে।"

শেষ পর্যন্ত সাগর যেতে রাজি হল। নাহার মঞ্জিল রাস্তা থেকে একটু ভিতরে, একসময়ে নিশ্চয়ই রাস্তা ছিল, দীর্ঘ দিন রাস্তা ব্যবহার করা হয়নি বলে ঝোপঝাড়ে ঢেকে আছে। ঝোপঝাড় ভেঙে রাজু আর সাগর আগুনালির পিছনে পিছনে যেতে থাকে। নাহার মঞ্জিলের কাছাকাছি পৌঁছে আগুনালি ফিসফিস করে বলল, "এইখানে থামো।"

রাজু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "বাসাটা কই?"

আগুনালি হাত দিয়ে দূরে একটা টিবির মত জিনিস দেখিয়ে দিল। অন্ধকারে ভালো বোঝা যায়না, কিন্তু একসময় নিশ্চয়ই অনেক বড় বাসা ছিল। রাজু চেষ্টা করেও বাসাটা ভালো করে দেখতে পেল না।

সাগর রাজু আর আগুনালি দুজনের মাঝখানে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে ছিল, কাঁপা গলায় বলল, "কখন আসবে ভূত?"

"কোনো ঠিক নাই। আগুনালি ফিসফিস করে বলল, এখনও আসতে পারে, আবার দেরিও হতে পারে।"

"আমরা এইখানে দাঁড়িয়ে থাকব?"

"ইচ্ছা হলে বসতেও পার। এই গাছে হেলান দিয়ে।"

রাজু, সাগর আর আগুনালি বড় একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে থাকে। কপাল ভাল মশা খুব বেশি নেই, তা না হলে ভূত দেখার শখ মিটে যেত। মাঝে মাঝে একটু-দুটা মশা পিনপিন করে খোঁজখবর নিয়ে চলে যাচ্ছে, খুব সাহসী হলে টুকুস করে একটা কামড় দিচ্ছে, তার বেশি কিছু নয়।

ওরা কতক্ষণ বসে ছিল কে জানে, হঠাৎ আগুনালি ফিসফিস করে বলল, "ঐ দেখো—"

রাজু আর সাগর চমকে উঠল, "কোথায়?"

"ঐ যে ওপরে দেখছ সাদামতো কী-একটা নড়ছে—"

রাজু ভালো করে তাকিয়ে হঠাৎ শিউরে উঠল, সত্যি সত্যি সাদামতো কী একটা যেন উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে। শক্ত করে সাগরকে ধরে রেখে সে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকে—ঠিক তখন সে একটা শব্দ শুনতে পেল মনে হল—একটা মেয়ের গলার স্বর। প্রথমে মনে হল কেউ যেন কিছু-একটা বলছে, তারপর মনে হল কথা বলছে না—কেউ-একজন কাঁদছে। একটু পর মনে হল, না, কাঁদছে না, কেউ-একজন গান গাইছে।

ভয়ে আর আতঙ্কে রাজুর শরীর অল্প অল্প কাঁপতে থাকে। আগুনালি ফিসফিস করে বলল, "ভয়ের কিছু নাই, আমার কাছে পীর সাহেবের তাবিজ আছে।"

সাগর গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ভূতেরা কি আমাদের দেখতে পাচ্ছে?"

আগুনালি বলল, "ভূতেরা সবকিছু দেখতে পায়।"

"তা হলে কি আমাদের কাছে আসবে?"

"না, আসবে না।"

রাজু তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে, আবছা সাদামতো জিনিসটা যেন ভেসে বেড়াচ্ছে, সাথে মেয়েলি গলার একটা শব্দ। হঠাৎ করে শব্দটা থেমে গেল—কোথাও কোনো শব্দ নেই। সাগর ভয়-পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হল? শব্দ বন্ধ হয়ে গেল কেন?"

হঠাৎ পুরুষকণ্ঠের একটা চিৎকার শোনা গেল। কেউ যেন খুব রেগে কিছু-একটা বলছে, তারপর মেয়েলি গলায় একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। রাজুর সারা শরীর আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে ওঠে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চলো যাই।"

আগুনালি ফিসফিস করে বলল, "আর দেখবে না?"

"না।"

"চলো তা হলে। ভয়ের কিছু নাই। খবরদার কেউ দৌড় দিও না। দৌড় দিলে ভয় বেশি লাগে। হেঁটে হেঁটে চলো।"

আগুনালির পিছনে সাগর, সাগরের পিছনে রাজু। খুব কাছাকাছি থেকে একজন আরেকজনকে ধরে তাড়াতাড়ি হেঁটে জায়গাটা পার হয়ে এল। ঝোপঝাড় ভেঙে যখন তারা বড় সড়কটাতে উঠে পড়ল তখন অন্ত-ভয়টা একটু কমে এল—রাজু শেষবারের মতো পিছনে তাকাল—তার ভুলও হতে পারে, কিন্তু মনে হল পিছনে নাহার মঞ্জিল থেকে ক্ষীণ একটা আলোর রেখা বের হয়ে আসছে।

সারা রাস্তায় কেউ কোনো কথা বলল না। বাসায় পৌঁছানোর পর তালা খুলে ঘরের ভিতরে ঢোকার পর আগুনালি দাঁত বের করে হেসে বলল, "ভূত দেখলে?"

রাজু আর সাগর মাথা নাড়ল।

"ভয় পেয়েছিলে?"

"পেয়েছিলাম।"

সাগর ফ্যাকাশে মুখে বলল, "এখনও ভয় লাগছে।"

"একা একা থাকতে পারবে?"

রাজু ভীত মুখে একবার সাগরের দিকে তাকাল, তারপর আগুনালির দিকে তাকাল। আগুনালি সাহস দেওয়ার মতো করে বলল, "কোনো ভয় নাই। যদি চাও তো আমার তাবিজটা দিয়ে যাই—"

"তাবিজ লাগবে না—রাজু ইতস্তত করে বলল, তুমি আজকে এখানে থেকে যাও।"

"আমি?"

"হ্যাঁ।"

আগুনালি মাথা চুলকে বলল, "বাড়িতে বলে আসি নাই, কিন্তু সেইটা নিয়ে অসুবিধা নাই। তবে—"

"তবে কী?"

"খাওয়া হয় নাই—"

"আমাদের অনেক খাবার বেঁচে গেছে। তোমাকে গরম করে দিই।"

"আরে ধুর! খাবার আবার গরম করতে হয় নাকি?"

খেয়েদেয়ে শোয়ার আগে আগুনালি দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমার বাজির টাকাটা?"

রাজু কোনো কথা না বলে ব্যাগ খুলে সেখান থেকে দশ টাকা বের করে আগুনালির হাতে দেয়। সে কখনও চিন্তা করেনি এরকম একটা বাজিতে সে হেরে যাবে।

৫. পঞ্চম দিন

ঘুম থেকে উঠে রাজু তার বিছানায় সোজা হয়ে বসে। রাত্রে ঘুম আসতে দেরি হয়েছে, কিন্তু সকালে ঘুম ভেঙেছে বেশ তাড়াতাড়ি।

বালিশে হেলান দিয়ে বসে সে গতরাতের ব্যাপারটা আবার চিন্তা করতে বসে, কিছুক্ষণেই তার মুখ দেখে মনে হতে থাকে তার বুঝি পেটব্যথা করছে।

আগুনালির ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেল রাজু পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ বসে আছে, সে আগে কখনও তাকে এভাবে দেখেনি। ভয়ে ভয়ে ডাকল, "রাজু—"

রাজু যখন গভীর চিন্তায় ডুবে থাকে তখন কেউ সহজে ডেকে তার সাড়া পায় না। কিন্তু এবারে রাজু সাথে সাথে মাথা ঘুরিয়ে আগুনালির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কী মনে হয় জান?"

আগুনালির থতমত খেয়ে বলল, "কিসের কী মনে হয়?"

"কালকে রাত্রে যে আমরা ভূত দেখেছিলাম—"

"কী হয়েছে সেই ভূতের?"

"আসলে সেটা ভূত ছিল না।"

আগুনালি এবারে একটু রেগে গেল। রেগে গিয়ে বলল, "কী ছিল তা হলে?"

"আমার মনে হয় ওই বাসাটায় কোনো মানুষ আছে।"

"মানুষ?"

"হ্যাঁ। একজন মেয়েমানুষ। সত্যিকারের মেয়েমানুষ।"

আগুনালি অবাক হয়ে রাজুর দিকে তাকিয়ে রইল।, খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। তারপর যখন বলার চেষ্টা করল তখন কোনো কথা বের না হয়ে সে তোতলাতে শুরু করল, বলল, "তো-তো-তো-তোমার মা-মা-থা খারাপ হয়েছে? ওখানে মা-মা-মা-মানুষ আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে। না হলে কাল রাতে আমরা চিৎকার শুনলাম কিসের? সত্যি সত্যি তো আর ভূত আসতে পারে না!"

আগুনালির মুখ রাগে থমথম করতে থাকে। সে হাতড়ে হাতড়ে বালিশের নিচে থেকে ম্যাচটা বের করে একটা কাঠি বের করে বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ফস করে জ্বালিয়ে মেঝেতে ছুড়ে দেয়, আগুনটা না নেভা পর্যন্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তার মানে তুমি তোমার টাকা ফেরত চাও?"

রাজু এবারে হেসে ফেলল। বলল, "আমি সেটা বলিনি। তোমার টাকা তুমি রাখো। আমি বলছি, যদি মনে কর সত্যিই ওই বাসায় কোনো মেয়েমানুষ আছে, কেউ তাকে ধরে আটকে রেখেছে, তা হলে আমাদের কি কিছু করা উচিত না?"

"কী করা উচিত?"

"তার কথা পুলিশকে গিয়ে বলা।"

আগুনালি এবারে মুখ বাঁকা করে হেসে বলল, "তুমি ভেবেছ পুলিশ তোমার কথা বিশ্বাস করবে? কোনোদিন বিশ্বাস করবে না।"

"সেটা পরে দেখা যাবে। আমাদের কথা বিশ্বাস না করলে আজগর মামাকে নিয়ে যাব।"

"পরে পুলিশ যদি গিয়ে দেখে আসলেই কেউ নেই, শুধু ভূত?"

রাজু মাথা চুলকে বলল, "আমার মনে হয় দিনের বেলা গিয়ে আমাদের জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।"

আগুনালি কোনো কথা না বলে রাজুর দিকে চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে রইল।

"দেখেশুনে যদি মনে হয় মানুষ আছে তা হলে পুলিশকে বললেই হবে।"

আগুনালি আরেকটা ম্যাচের কাঠি বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষে জ্বালিয়ে ছুড়ে দিয়ে বলল, "যদি ওইখানে কোনো বদমাইশ মানুষ অন্য মানুষকে ধরে আটকে রেখে থাকে তা হলে সে তোমাকে কি কোলে তুলে আদর করবে?"

"না, তা করবে না। তাই কাজটা হবে লুকিয়ে।"

"পরিষ্কার দিনের বেলা সেটা তুমি কীভাবে করবে?"

রাজু আবার মাথা চুলকে বলল, "প্রথমে শুধু বাইরে থেকে দেখব। মামার বাইনোকুলারটা নিয়ে যাবে, সেটা দিয়ে দূর থেকে খুব পরিষ্কার দেখা যাবে।"

আগুনালি কোনো কথা না বলে আরেকটা ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে ছুড়ে দিল। রাজু হঠাৎ বিছানা থেকে নেমে বলল, "আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"আমাদের এখনই গিয়ে জায়গাটা ভালো করে দেখা উচিত।"

"এখনই?"

"হ্যাঁ। যদি সত্যি কেউ কাউকে আটকে রেখে থাকে তা হলে যত দেরি হবে ততই তো বিপদ বাড়তে থাকবে।"

আগুনালি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "সত্যি যদি কেউ কাউকে আটক রেখে থাকে তা হলে অনেকদিন থেকে আটকে রেখেছে, আরও দুই-এক ঘন্টা দেরি হলে কোনো অসুবিধে হবে না।"

রাজু বলল, "তা ঠিক। তা ছাড়া সাগর ঘুম থেকে না ওঠা পর্যন্ত আমরা তো যেতেও পারব না।

রাজু একটু অস্থিরভাবে ঘরের এক পাশ থেকে অন্য পাশে হেঁটে এসে বলল, "সাগরটা যা ঘুমাতে পারে, ওকে ঠেলে না তুললে কোনোদিন ঘুম থেকে উঠবে না!"

আগুনালি বলল, "আহা, ছোট মানুষ। ঘুমাক।"

"যতক্ষণ ঘুমাচ্ছে ততক্ষণে আমরা নাস্তা তৈরি করে ফেলি।"

আগুনালি দাঁত বের করে হেসে বলল, "খাঁটি কথা! কী আছে নাস্তা তৈরি করার?"

রাজু মাথা চুলকে বলল, "মুড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। মনে হয় একটা-দুটা ডিম থাকতে পারে। কয়টা বিচিকলাও আছে মনে হয়।"

নাস্তার বর্ণনা শুনে আগুনালি মোটেও দমে গেল না, হাতে কিল দিয়ে বলল, "ডিম আর মুড়িভাজি ফাস্ট ক্লাস নাস্তা! সাথে চা। সকালবেলা কড়া এক কাপ চা না খেলে শরীরটাতে জুত হয় না! চুলাটা কোন দিকে?"

সকালের উঠে চুলা জ্বালিয়ে রান্নাবান্না শুরু করার রাজুর কোনো ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সে ভুলেই গিয়েছিল আগুনালির আনন্দই হচ্ছে আগুনে। একটু পরেই দেখা গেল চুলায় দাউদাউ করে বিশাল একটা আগুন জ্বলছে এবং তার সামনে আগুনালি মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। আগুনটা খানিকক্ষণ উপভোগ করে চুলার মাঝে কড়াই চাপিয়ে তেল ঢেলে তেলটা গরম হওয়ার পর তার মাঝে পেঁয়াজ মরিচ কেটে দিয়ে খানিকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে সে ডিমগুলি ভেঙে ছেড়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। আগুন নিয়ে আগুনালির কোনো ভয় নেই, তাই তার কাজকর্ম খুব ঝটপটে, মনে হয় সাংখাতিক একজন বাবুর্চি। তারপর কড়াই ভরে মুড়িগুলি ভাজা করে আগুনালি সেটা চুলা থেকে নামিয়ে নিয়ে কেতলি চাপিয়ে দেয়। আগুনের আঁচে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে সেটা তার ভালোই লাগছে। কেতলির পানি ফুটে উঠলে সেখানে চায়ের পাতা দিয়ে বলল, "নাস্তা রেডি, সাগরকে ডেকে তোলো।"

সাগরকে সকালবেলা ঘুম থেকে ডেকে তোলা খুব সহজ কাজ নয়, কিন্তু আজকে ব্যাপারটা খুব কঠিন হল না। সে চোখ কচলে ঘুম থেকে উঠে জিজ্ঞেস করল, "আজগর মামা কি এসেছেন?"

"না।"

"তা হলে চান মিয়া?"

"না।"

"তা হলে নাস্তা তৈরি করছে কেন?"

"আগুনালি।"

আগুনালির নাম শুনেই সে গুটিগুটি বিছানা থেকে নেমে হাতমুখ ধুয়ে আসে।

আগুনালির তৈরি ডিম এবং মুড়িভাজাটা খেতে খুব ভালো হলেও চা-টা মুখে দেওয়া গেল না। দুধ নেই বলে সেটা কালো এবং তিতকুটে। সাগর মুখে দিয়ে বলল, "ইয়াক থুঃ!"

আগুনালি উষ্ণ স্বরে বলল, "কী হয়েছে? লিকার চা খাও নাই কোনোদিন?"

রাজু বলল, "এটা মোটেও লিকার চা না। এটা ইঁদুর মারার বিষ। এক কাপ খেলে পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিদ্র হয়ে যাবে।"

রাজুর কথাটা ভুল প্রমাণ করার জন্যেই মনে হয় আগুনালি কুচকুচে কালো বিষের মতো চা-টা এক ঢোকে শেষ করে দিল। শুধু তা-ই না, ঠোঁট চেটে বলল, "ফাস্ট ক্লাস!"

রাজু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চলো, এখন যাই।"

সাগর জিজ্ঞেস করল, "কোথায়? মাকড়শা-কন্যা দেখতে?"

"না, নাহার মঞ্জিলে।"

"সেখানে কেন? দিনের বেলা তো আর সেখানে ভূত থাকবে না।"

"না।" রাজু একটু ইতস্তত করে বলল, "আসলে আমার মনে হয় ঐ নাহার মঞ্জিলে একটা মেয়েকে দুষ্ট মানুষেরা বেঁধে রেখেছে।"

সাগরের চোখ বড় বড় হয়ে গেল সাথে সাথে। একবার রাজুর দিকে, আরেকবার আগুনালির দিকে তাকাল সে সত্যি কথা বলছে, নাকি তার সাথে ঠাট্টা করছে বোঝার জন্য। রাজু গম্ভীর মুখ করে বলল, "আমরা এখনও জানি না সেটা সত্যি কি না। কিন্তু যদি সত্যি হয় তা হলে আমাদের পুলিশকে বলতে হবে।"

সাগরের চোখ হঠাৎ উত্তেজনায় চকচক করতে থাকে, সে একবার ঢোক গিয়ে বলল, "ভাইয়া, চলো মামার বন্দুকটা নিয়ে যাই—বন্দুক দেখলে সব দুষ্ট মানুষ সারেন্ডার করে ফেলবে—"

রাজু হাসি চেপে বলল, "প্রথমেই বন্দুক নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। আগে জায়গাটা দেখে আসি।"

সাগর সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল, বলল, "চলো যাই।"

একটু পরে দেখা গেল তিন সদস্যের এই দলটি রাস্তা ধরে হাঁটছে। সবার সামনে সাগর—তার হাতে একটা লম্বা লাঠি। সবার পিছনে রাজু—তার গলা থেকে বাইনোকুলারটা ঝুলছে, তার মুখ গভীর চিন্তাগ্রস্ত—দেখে মনে হচ্ছে বুঝি পেটব্যথা করছে। মাঝখানে আগুনালি, এক হাতে সে একটার পর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে যাচ্ছে। নাহার মঞ্জিলের কাছাকাছি এসে রাজু দাঁড়িয়ে গেল। আগুনালি কাছে এসে বলল, "কী হয়েছে?"

"আমাদের ওই বাসাটার কাছে লুকিয়ে যেতে হবে।"

"কেন?"

"বাসায় যদি সত্যি কেউ থাকে তা হলে আমাদের দেখে সাবধান হয়ে যাবে।"

আগুনালি কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বলল, "চলো তা হলে এই জঙ্গলে ঢুকে যাই, জঙ্গল দিয়ে জঙ্গল দিয়ে চলে যাব।"

সাগর ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল, "এই জঙ্গলে বাঘ-ভালুক নেই তো?"

আগুনালি কিছু বলার আগেই রাজু বলল, "না সাগর, তোকে আমি কতবার বলেছি এইসব জঙ্গলে বাঘ-ভালুক থাকে না।"

আগুনালি দাঁত বের করে হেসে বলল, "আর থাকলেই ক্ষতি কী? তোমার হাতে ঐ বড় লাঠিটা দিয়ে দড়াম করে মাথার মাঝে একটা বসিয়ে দিও, বাঘ-ভালুক বাপ বাপ করে পালাবে।"

সাগরকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে সে খুব রেগে যায়, এবারেও সে রেগে গেল, কিন্তু রেগে গিয়েও সে কিছু বলল না। সত্যি সত্যি যদি দুষ্ট মানুষেরা একজনকে আটকে রেখে থাকে, তা হলে তাকে উদ্ধার করার জন্য মনে হয় ঠাট্টা-তামাশা একটু সহ্য করতে হবে।

নাহার মঞ্জিলের কাছাকাছি এসে রাজুর বেশ আশাভঙ্গ হল, সত্যি সত্যি এটা পোড়োবাড়ি, পুরো বাড়িটা মনে হচ্ছে ধসে পড়ছে। দেয়াল ভেঙে পড়ে আছে, ইট-পাথরের স্তূপ, পোড়া দরজা-জানালা, দীর্ঘদিন অব্যবহারে সারা বাসায় স্থানে স্থানে গাছগাছড়া উঠে এসেছে। রং-উঠা বিবর্ণ ভয়ংকর একটা ধ্বংসস্তূপ। এরকম বাসায় কোনো মানুষ থাকবে কিংবা কেউ জোর করে কাউকে আটকে রাখবে বলে মনে হয় না। তবুও সে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আজগর মামার বাইনোকুলারটা দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে, কিন্তু পুরো বাসায় সে কোনো জনমানুষের চিহ্ন খুঁজে পেল না। রাজুর সাথে সাথে আগুনালিও দেখল, সাগরও দেখল, কিন্তু কোনো লাভ হল না।

এক পাশ থেকে কিছু না দেখে তারা সাবধানে বাসার অন্যপাশে গিয়ে আবার বাসাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, সেখানেও কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। এতক্ষণে সাগর আর আগুনালি এই ভাঙা বিধ্বস্ত বাসায় মানুষ খোঁজাখুঁজি করায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। সাগর বিরক্ত হয়ে একটা গাছের গোড়ায় বসে একটু পরেপরে বলতে লাগল, "চলো মাকড়শা-কন্যা দেখতে যাই।"

সাগরের মাথায় কিছু-একটা ঢুকে গেলে খুব বিপদ, তখন সে ভাঙা রেকর্ডের মতো একটা জিনিস বারবার বলতে থাকে। রাজুর ধৈর্য ছুটে যাবার মতো অবস্থা হল। সাগরের এই ঘ্যানঘ্যান থেকে দূরে সরার জন্যে এবং একই সাথে একটু ওপর থেকে দেখার জন্যে সে সাবধানে একটা গাছ বেয়ে ওপরে উঠবে বলে ঠিক করল। আগুনালিকে কথাটা বলতেই সে ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি আগে গাছে উঠেছ?"

"বেশি উঠিনি, কিন্তু উঠেছি।"

"জুতা জোড়া খুলে যাও।"

রাজু জুতা জোড়া খুলে গাছে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে। নিচে ডালপালা বেশি নেই, তাই আগুনালি তাকে ঠেলেঠুলে একটু ওপরে তুলে দেয়, বাকি অংশটুকু তখন মোটমুটি সহজ হয়ে গেল। গাছ বেয়ে বেয়ে অনেকটুকু ওপরে উঠে সে আবার নাহার মঞ্জিলের দিকে তাকাল। নিচে থেকে একেবারে বোঝা যায় না, কিন্তু ওপরে বেশ কয়েকটি ঘর রয়েছে এবং এই ঘরগুলো বেশি ভেঙেচুরে যায়নি। সে তীক্ষ্ণ চোখে ঘরগুলোর দিকে তাকাল, একটা জানালা দিয়ে মনে হল ভিতরে দেখা যাচ্ছে এবং হঠাৎ মনে হল ভিতরে কিছু-একটা নড়ছে। সে তাড়াতাড়ি বাইনোকুলারটি চোখে লাগিয়ে জানালার দিকে তাকায়। বাইনোকুলার ফোকাস করতেই জানালাটি ওর একেবারে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অবাক হয়ে দেখে সত্যি জানালা দিয়ে ভিতরে কিছু-একটা দেখা যাচ্ছে, আবছা মনে হচ্ছে একজন মানুষ নড়ছে।

রাজুর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ দেখতে পেল ঘরের ভিতর থেকে মানুষটি জানালার কাছে এসে জানালার শিক ধরে বাইরে তাকাল, রাজু প্রায় চিৎকার করে উঠছিল, অনেক কষ্ট করে নিজেকে সামলে নেয়। ঠিক তার বয়সী একটা মেয়ে জানালার শিক ধরে তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। রাজু তাড়াতাড়ি তার চোখ থেকে বাইনোকুলারটি নামিয়ে নেয়। না, মেয়েটি কাছে নয়, বহুদূরে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এইদিকে তাকিয়ে আছে সত্যি, কিন্তু তাকে দেখছে না।

আগুনালি নিচে থেকে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করল, "কী হল, কাউকে দেখলে?"

রাজু আবার চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি।"

"সত্যি? কে?"

"দাঁড়াও বলছি—" রাজু আবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করল মেয়েটির মাঝে একধরনের অস্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে যেরকম আগে কখনও তার চোখে পড়েনি। এত সুন্দর মানুষের চেহারা কেমন করে হয়? রাজুর মনে হতে থাকে মেয়েটি বুঝি মানুষ নয়, বুঝি কোনো অশরীরী প্রাণী। বুঝি আকাশের পরী।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার বুকের মাঝে একটা ভয়ংকর কষ্ট হতে শুরু করে। কেউ তাকে বলে দেয়নি, কিন্তু তবু সে বুঝতে পারে এই মেয়েটি খুব দুঃখি মেয়ে। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য নিয়েও এই মেয়েটির মতো দুঃখি মেয়ে সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই। রাজু রুদ্ধ নিশ্বাসে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল, আর ঠিক তখন মেয়েটি দুই হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে নেয়, তারপর জানালার শিকে মাথা লাগিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটি কি কাঁদছে?

আগুনালি নিচে থেকে বলল, "কী হল?"

রাজু চাপাস্বরে বলল, "দাঁড়াও বলছি।"

আবার সে মেয়েটির দিকে তাকাল, দুই হাত থেকে মুখটি তুলে সে আবার তাকাল রাজুর দিকে। রাজু তাড়াতাড়ি বাইনোকুলার সরিয়ে নেয় চোখ থাকে। না, মেয়েটি তাকে দেখেনি, এদিকে তাকিয়ে আছে সত্যি, কিন্তু তাকে দেখছে না। রাজু আবার চোখে বাইনোকুলার তুলে নেয়—মেয়েটি জানালার শিকে মুখ লাগিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে খুব ধীরে ধীরে ঘুরে ঘরের ভিতরের দিকে চলে গেল। যাওয়ার ভঙ্গিটি এত দুঃখের যে হঠাৎ রাজু মনে হল যে তার বুঝি বুক ভেঙে যাবে।

নিচে থেকে আগুনালি আবার বলল, "কী হল? কথা বল না কেন?"

রাজু বলল, "বলছি দাঁড়াও।" বাইনোকুলারটা গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিচে নেমে আসে। আগুনালি আর সাগর ঘিরে দাঁড়াল রাজুকে। সাগর অধৈর্য গলায় বলল, "কী দেখেছ ভাইয়া?"

"একটা মেয়ে।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"কী করছে মেয়েটা?"

"কাঁদছে। মনে হয় মেয়েটাকে কেউ আটকে রেখেছে।"

আগুনালি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর নিশ্বাস ফেলে বলল, "কত বড় মেয়েটা?"

"আমাদের বয়সী। এত সুন্দর মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।"

আগুনালি হাত বাড়িয়ে বলল, "আমাকে দূরবিনটা দাও, দেখে আসি।"

রাজু গলা থেকে খুলে বাইনোকুলারটা আগুনালির হাতে দিয়ে বলল, "ভিতরের দিকে চলে গেছে এখন, জানি না তুমি দেখতে পারবে কি না।"

আগুনালি গাছ বেয়ে বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করতে করতে বলল, "দেখি চেষ্টা করে।"

সাগর ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমিও দেখব, আমিও দেখব।"

রাজু নিচু গলায় বলল, "গাছের উপরে না উঠলে তুই দেখতে পারবি না।"

"আমি গাছে উঠব।"

"তুই নাগাল পাবি না, অনেক উঁচু গাছ।"

সাগর কী-একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই গাছের উপর থেকে আগুনালি বলল, "কোন জানালাটা রাজু?"

"বাম দিকের জানালা।"

আগুনালি বাইনোকুলার চোখে তাকিয়ে থাকে। রাজু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, "দেখেছ?"

"ভিতরে কিছু-একটা নড়ছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।"

"ঐটাই মেয়েটা।"

আগুনালি আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করল, কিন্তু মেয়েটি আর জানালার কাছে এল না। সে হয়তো আরও অপেক্ষা করত, কিন্তু রাজু নিচে থেকে ডেকে বলল, "আগুনালি, নিচে নেমে আসো।"

"কে?"

"কী করা যায় ঠিক করতে হবে না?

আগুনালি তখন গাছ ধরে ধরে নিচে নেমে এল। গাছ থেকে একটা বিষপিঁপড়া আগুনালির শরীরে উঠে গিয়ে গলা বেয়ে নেমে যাচ্ছিল, সেটাকে দুই আঙুল দিয়ে ফেলতে ফেলতে বলল, "এখন কী করবে?"

"পুলিশে খবর দিতে হবে।"

"পুলিশ!" আগুনালি কেমন যেন ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "পুলিশ কোনোদিন তোমার কথা বিশ্বাস করবেনা।"

"কেন বিশ্বাস করবে না?"

"ছোটদের কথা বড়রা বিশ্বাস করে না। বড় একজনকে নিয়ে যেতে হবে।"

রাজু মাথা চুলকে বলল, "কিন্তু বড় মানুষ কোথায় পাব? চলো আমরা নিজেরাই গিয়ে চেষ্টা করি।"

আগুনালি মাথা নাড়ল, বলল, "না, কাজ হবে না। আর মনে কর পুলিশ তোমার কথা বিশ্বাস করে এসে দেখল মেয়েটা আসলে এখানে থাকে।"

"এখানে থাকে?"

"থাকতেও তো পারে। গরিব মানুষ থাকার জায়গা নেই—এখানে উঠেছে।"

রাজু মাথা নাড়ল, "না, মেয়েটাকে দেখে গরিব মানুষের মেয়ে মনে হল না। একেবারে পরীর মতো চেহারা।"

আগুনালি রেগে গিয়ে বলল, "আমি অনেক গরিব মানুষের মেয়ে দেখেছি, তাদের পরীর মতো চেহারা। আমার আপন ফুপাতো বোন—"

রাজু বাধা দিয়ে বলল, "আমি সেকথা বলছি না। দেখে মনে হয় না গরিব মানুষের মেয়ে থাকতে এসেছে। দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জোর করে আটকে রেখেছে—"

আগুনালি পা দিয়ে মাটি খুঁটতে খুঁটতে বলল, "কী প্রমাণ আছে?"

রাজু রেগে গিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। সত্যিই তো, কী প্রমাণ আছে? খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তা করে রাজু অন্যমনস্কভাবে বলল, "আমাদের একটু খোঁজখবর নিতে হবে।"

হ্যাঁ, আগুনালি মাথা নেড়ে বলল, "সত্যি সত্যি যদি পুলিশের কাছে যাবে, তা হলে আগে খোঁজখবর নিয়ে একেবারে পাকা খবর জানতে হবে।"

"কিন্তু কীভাবে খবর নেবে?"

সাগর এতক্ষণ দুজনের কথাবার্তা শুনছিল, কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছিল না, দুজন থামতেই সে বলল, "মেয়েটাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই হয়!"

দুজনে সাগরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল, রাজু মুখ শ.চ করে জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে জিজ্ঞেস করবি মেয়েটাকে? টেলিফোনে?"

সাগরকে একটু বিভ্রান্ত দেখায়, মাথা চুলকে বলল, "দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে জোরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করা যায় না?"

"আর তোর চিৎকার শুনে যখন সবাই লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসবে?"

"আস্তে আস্তে চিৎকার করবে।"

আগুনালি হেসে ফেলে বলল, "আস্তে আস্তে মানুষ কেমন করে চিৎকার করে?"

সাগরকে আবার খুব বিভ্রান্ত দেখা গেল।

রাজু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "আমাদের বাসার দরজায় গিয়ে খোঁজ নিতে হবে।"

সাগর চোখ বড় বড় করে বলল, "যদি লাঠি নিয়ে আসে?"

"খুব কায়দা করে খোঁজ নিতে হবে, যেন বুঝতে না পারে। গিয়ে ভান করব রাস্তা হারিয়ে এসে গেছি।"

"না—" আগুনালি মাথা নাড়ল, "রাস্তা হারিয়ে কেউ এখানে আসতে পারে না।"

"তা হলে কী করা যায়?"

আগুনালি পকেট থেকে ম্যাচ বের করে ফস করে একটা কাঠি জ্বালিয়ে বলল, "আমি চেষ্টা করতে পারি।"

"কী চেষ্টা করবে?"

"খালিগায়ে একটা গোরু নিয়ে ভিতরে ঢুকে যাই যেন ঘাস খাওয়াতে এনেছি, তা হলে কেউ সন্দেহ করবে না।"

"গোরু? গোরুর কোথায় পাবে?"

"আশেপাশে কত গোরু চরে বেড়ায়, একটা খুঁজে বের করে নেব।"

রাজু আগুনালির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, একটি গরু নিয়ে কোথাও ঢুকে যাওয়া কত সহজ তার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু মনে হয় বুদ্ধিটা খারাপ না। সে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে, তা হলে যাও। আমরা রাস্তায় অপেক্ষা করব।"

খানিকক্ষণ পর দেখা গেল আগুনালি খালিগায়ে একটা লাল রঙের ছোটখাটো গোরু নিয়ে পুরোপুরি রাখাল ছেলের মতো উদাস-উদাস মুখ করে নাহার মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখে কে বলবে এটি তার গোরু নয় কিংবা সে খাঁটি রাখাল নয়!

রাজু সাগরকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতে থাকে। হেঁটে হেঁটে তারা এক মাথায় চলে যায়, সেখানে একটা ছোট সাঁকো রয়েছে। সাঁকোর উপরে দাঁড়িয়ে তারা নিচে পানির দিকে তাকিয়ে থাকে। ছোট ছোট কচুরিপানা ভেসে ভেসে যাচ্ছে। সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে তারা সেগুলির উপর থুতু ফেলার চেষ্টা করে। কাজটি যত সোজা মনে হয় তত নয়। অনেকক্ষণ সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে থেকে তারা আবার রাস্তা ধরে নাহার মঞ্জিলের দিকে

হেঁটে যেতে থাকে। রাস্তায় একজন চাষি ধরনের বুড়ো মানুষকে খুব উদ্বিগ্ন মুখে হেঁটে যেতে দেখল, দেখে মনে হয় কিছু একটা হারিয়ে গেছে। ঠিক ঐ সময় রাস্তার অন্য পাশে আগুনালিকে দেখা গেল, সে জঙ্গল থেকে বের হয়ে হনহন করে হেঁটে আসছে। উদ্বিগ্ন মুখের বুড়ো মানুষটা আগুনালিকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "একটা লাল গাই দেখেছ এইদিকে?"

আগুনালি থতমত খেয়ে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, ঐ তো ওখানে ঘাস খাচ্ছে।"

উদ্বিগ্ন বুড়োর মুখে স্বস্তি ফিরে আসে, সাথে সাথে সে গোরুটাকে উদ্ধার করার জন্যে তাড়াতাড়ি হেঁটে যেতে থাকে। আগুনালি নিজেই যে গোরুটাকে ওখানে নিয়ে গেছে জানতে পারলে মনে হয় বড় ঝামেলা ঘটে যেত।

রাজু সাগরকে নিয়ে প্রায় ছুটে গেল আগুনালির কাছে। আগুনালি তার শার্টটা পরতে পরতে বলল, "ব্যাপার কেরাসিন!"

"কেন, কী হয়েছে?"

"ভিতরে অন্য লোকও আছে।"

"অন্য লোক? কয়জন? কীরকম লোক?"

আগুনালি শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে মাটিতে পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, "বলছি শোনো।"

আগুনালি খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারে না—যেটা আগে বলার কথা সেটা পরে বলে এবং যেটা পরে বলার কথা সেটা আগে বলে ফেলে। যে-কথাটা বলার কোনো প্রয়োজন নেই সেটা অনেক সময় লাগিয়ে বর্ণনা করে। যেমন গোরুটা কী ধরনের ঘাস খেতে পছন্দ করে এবং কেমন করে ঘাস খায় সেটা কয়েকবার বলে ফেলল। তাকে নানাভাবে প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত রাজু যে-জিনিসটা বুঝতে পারল সেটা এরকম : আগুনালি গোরুটা নিয়ে হেঁটে হেঁটে নাহার মঞ্জিলের ভাঙা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়ে সামনের ফাঁকা জায়গাতে ঘাস খাওয়াতে খাওয়াতে বাসাটা ভালো করে লক্ষ করছিল। তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই সেটা প্রমাণ করার জন্যে গুনগুন করে একটা গান গাইতে গাইতে বাসার দরজায় বসে পড়ল, তখন একটা লোক বের হয়ে তাকে ধমক দিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বলল। লোকটাকে দেখে মনে হয় বাসার দারোয়ান। আগুনালি তখন খুব অবাক হবার ভান করে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, এই বাসায় সে কেমন করে থাকে, কারণ রাত হলেই এখানে ভূত আসে। লোকটা বলল, জিন-ভূত কোনোকিছুকেই সে ভয় পায় না। আগুনালি তখন জানতে চাইল সে এই বাসায় জিন-ভূত কোনোকিছু দেখেছে কি না, কারণ লোকজন বলে রাত হলে নাকি এই বাসা থেকে মেয়েলোকের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়।

মেয়েলোকের গলার আওয়াজের কথা শুনে লোকটা কেমন যেন ঘাবড়ে গেল, তখন সে জানতে চাইল লোকজন আর কী কী কথা বলে। আগুনালি তখন বানিয়ে বানিয়ে আরও কিছু কথা বলল যেন লোকটা কোনোকিছু সন্দেহ না করে। লোকটা কথাবার্তা বেশি বলতে চায় না, তবু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যেসব কথা বের করেছে তার থেকে মনে হল কাশেম আলি চৌধুরীর ছেলে হাসান আলি চৌধুরী তাদের বাড়িটা ঠিক করার চিন্তাভাবনা করছে, তাই আপাতত এই মানুষটা পাহারা দেয়ার জন্যে এই বাসায় উঠে এসেছে। মানুষটা বলল, এই বাসায় সে একাই থাকে—আর কেউ থাকে না, যেটা পুরোপুরি মিথ্যা কথা।

রাজু জিজ্ঞেস করল, "কাশেম আলি চৌধুরীর ছেলে কী করে?"

"জানি না।"

"বয়স কত?"

"তাও জানি না।"

তারা যে-রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল রাস্তাটা মোটামুটি নির্জন, বেশি মানুষের চলাচল নেই। হঠাৎ দেখা গেল দূর থেকে একজন মানুষ হেঁটে আসছে, আগুনালি মাথা ঘুরিয়ে মানুষটিকে দেখে কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রাজু জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"দারোয়ান।"

"নাহার মঞ্জিলের দারোয়ান?"

"হ্যাঁ, আমাকে এখন তোমাদের সাথে দেখে ফেলেছে, কিন্তু একটা-না সন্দেহ করে ফেলে!"

মানুষটা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, কিছু করার উপায় নেই। তিনজন কিছুই হয়নি এরকম একটা ভাব করে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে হেঁটে যেতে থাকে। মানুষটা সরু চোখে তাদের দেখল, এবং হঠাৎ আগুনালিকে চিনতে পেরে কেমন যেন চমকে উঠল। তাকে কিছু-একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই তারা তাড়াতাড়ি হেঁটে সরে গেল। মানুষটা হেঁটে যেতে যেতে একটু পরেপরে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না।

আগুনালি মাথা চুলকে বলল, "দারোয়ানটা আমাকে চিনে ফেলেছে। ঝামেলা হয়ে গেল।"

রাজু চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ল। সাগর বলল, "এখন বাসায় কোনো দারোয়ান নেই, গিয়ে মেয়েটার সাথে কথা বলতে চাও?"

রাজু চমকে উঠে সাগরের দিকে তাকাল, তারপর বলল, "সাগর ঠিক বলেছে। এই সুযোগ!"

আগুনালি ইতস্তত করে বলল, "কী জিজ্ঞেস করবে মেয়েটাকে?"

"জিজ্ঞেস করব কেন আটকে রেখেছে, কে আটক রেখেছে—এইসব।"

"সত্যি?"

"সত্যি না তো মিথ্যা? চলো তাড়াতাড়ি যাই।"

সাগর জিজ্ঞেস করল, "আমরা সবাই যাব?"

"না। একজন যাব, অন্য দুইজন বাইরে থাকবে, হঠাৎ যদি দারোয়ানটা এসে যায় তা হলে যেন সাবধান করা যায়।"

সাগর বলল, "আমি যাব, ঠিক আছে?"

রাজু মাথা নাড়ল, "না সাগর, তুই বেশি ছোট। গিয়ে ঠিক করে কথা বলতে পারবি না।"

"কে বলেছে পারব না?" সাগর রেগে উঠে বলল, "একশোবার পারব!"

"ঠিক আছে, পারবি। কিন্তু তুই তো ছোট, মেয়েটা মনে করবে তোর সাথে কথা বলে কোনো লাভ নেই। ছোটদের কেউ বেশি পাত্তা দেয় না। ভিতরে গেলে যাব আমি নাহয় আগুনালি।"

আগুনালি বলল, "তুমিই যাও—আমি মেয়েদের সাথে ভালো করে কথা বলতে পারি না।"

রাজু একটু অবাক হয়ে আগুনালির দিকে তাকাল, কী-একটা বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমিই যাব। তাড়াতাড়ি চলো।"

রাজু আগুনালি আর সাগরকে বাসার কাছাকাছি দাঁড় করিয়ে রেখে বলল, হঠাৎ করে যদি দারোয়ানটা এসে যায় তা হলে যেন তাকে সাবধান করে দেয়। দারোয়ানটার মনে সন্দেহ না জাগিয়ে কেমন করে সাবধান করা যায় সেটা নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা করে ঠিক করা হল, আগুনালি কোনো কথা না বলে মুখে আঙুল দিয়ে শিস দেবে—দারোয়ানটা অনেক দূরে থাকতেই যদি শিস দেওয়া হয় সে হয়তো সন্দেহ করবে না। অনেক দূরে থাকতেই তাকে দেখার জন্যে সাগর রাস্তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দূর থেকে দারোয়ানটা দেখে ফেললে সাগর ছুটে এসে আগুনালিকে বলবে, আগুনালি তখন রাজুকে বিপদ-সংকেত দেবে।

মোটামুটি সব প্রস্তুতি নিয়ে রাজু সাবধানে নাহার মঞ্জিলে ঢোকে। বাইরে দরজা নেই, একসময়ে ছিল, পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ভিতরে নানারকম জঞ্জাল, সবকিছু পার হয়ে সে বড় একটা ঘরে হাজির হল। এই ঘরটির এক কোনায় খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে সেখানে বিছানাপত্র গোটানো আছে। দারোয়ান মানুষটি নিশ্চয়ই রাত্রিবেলা এখানে ঘুমায়। রাজু সাবধানে চারিদিকে তাকিয়ে আরেকটু এগিয়ে যায়। সামনে আরেকটি ঘর, সেখান থেকে একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। মেয়েটাকে দোতলায় কোনো ঘরে আটক রাখা আছে, কাজেই রাজু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে।

সিঁড়িটা জরাজীর্ণ, একসময় নিশ্চয়ই রেলিং ছিল, এখন ভেঙেচুরে গেছে। রাজু সাবধানে দেয়াল ধরে উপরে উঠে যায়। দোতলায় বেশ অনেকগুলি ঘর, বেশির ভাগই ধসে পড়ে যাচ্ছে, শুধু একটি ঘরে নূতন কাঠের শক্ত দরজা লাগানো হয়েছে, সেই দরজায় একটা তালা ঝুলছে। এই ঘরটাতে নিশ্চয়ই মেয়েটিকে আটকে রেখেছে, গাছের উপরে উঠে এইদিকেই সে বাইনোকুলার দিয়ে দেখেছিল। রাজু পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে তালাটা হাত দিয়ে দেখে, আজগর মামার বাসাতেও ঠিক এরকম তালা। হঠাৎ আর একটা কথা মনে হল, এমন কি হতে পারে—আজগর মামার বাসায় তালার যে-চাবি রয়েছে সেটা দিয়ে এই তালাটা খোলা যাবে? তালাগুলি দেখতে একই রকম, চাবিগুলিও যদি মিলে যায়? রাজুর পকেটেই মামার বাসার তালার চাবিগুলি রয়েছে—সে সাবধানে পকেট থেকে চাবির রিং বের করে সবরকম দোয়া-দরুদ পড়ে তালাটা খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু তালাটা খুললনা না।

রাজু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল, সে কি দরজায় শব্দ করে এখান থেকে মেয়েটার সাথে কথা বলবে? কিন্তু সামনাসামনি একজন আরেকজনকে না দেখে কথা বলাটা রাজুর বেশি পছন্দ হল না। সে হেঁটে পাশের ঘরটিতে গেল, দরজার-জানালা ভেঙে পড়ে আছে, ভিতরে নানারকম জঞ্জাল। সে জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিল, কার্নিস ধরে হেঁটে পাশের ঘরের জানালার সামনে যাওয়া যেতে পারে, পা পিছলে গেলে নিচে পড়ে যাবে, কিন্তু শুধুশুধু তো আর কারও পা পিছলে যেতে পারে না। রাজু কার্নিসে নামার আগে একটু এদিকে-সেদিকে দেখে এল, হঠাৎ করে যদি আগুনালির শিস শোনা যায় তা হলে ছুটে পালাতে হবে। সামনের দরজা দিয়ে পালানোর সুযোগ হবে না, অন্য কোন দিকে দিয়ে যাওয়া যেতে পারে ভালো করে দেখে রাখল। পুরো বাসটাই একটা ধ্বংস্তূপের মতো, কাজেই অনেক দিক দিয়ে পালানোর সুযোগ রয়েছে। ইচ্ছে করলে এই কার্নিস ধরে সামনে গিয়েই একটা ভাঙা দেয়াল ধরে নেমে যাওয়া যাবে। জায়গাটা ভালো করে পরীক্ষা

করে সে সাবধানে কার্নিস ধরে হাঁটতে থাকে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই জানালা, সে কাছে যেতেই দেখল মেয়েটি জানালার শিক ধরে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার, মেয়েটার চোখে এতটুকু বিস্ময় নেই, অত্যন্ত শান্ত চোখে সে রাজুর দিকে তাকিয়ে আছে। বাইনোকুলারে মেয়েটাকে যেটুকু সুন্দর মনে হয়েছিল সামনাসামনি সে তার থেকে অনেক বেশি সুন্দর। হঠাৎ দেখলে কেমন যেন নিশ্বাস আটকে আসে।

রাজু একটু হকচকিয়ে গেল, তারপর সে এমন একটা ভান করল যেন কার্নিস ধরে হেঁটে হেঁটে এসে তালা দিয়ে আটকে-রাখা একটা মেয়ের সাথে দেখা করা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। সে একটু হাসিহাসি মুখ করে বলল, "আমি রাজু। তোমার নাম কী?"

মেয়েটা এমনভাবে রাজুর দিকে তাকিয়ে রইল যে তার মনে হল সে তার কথা শুনতে পায়নি। রাজু আবার কী-একটা বলতে যাচ্ছিল, তখন মেয়েটা বলল, "তুমি এখানে কেন এসেছ, রাজু?"

"আমি—আমি—মানে আমি দেখতে এসেছি তোমার কোনো বিপদ হয়েছে কি না।"

"আমার যদি বিপদ হয় তুমি কী করবে?"

রাজু একটু থতমত খেয়ে বলল, "তোমাকে সাহায্য করব।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"আমাকে ছুঁয়ে বলো—" বলে মেয়েটি জানালা দিয়ে তার হাত বাড়িয়ে দিল।

রাজু কী করবে বুঝতে না পেরে মেয়েটার হাত ছুঁয়ে বলল, "আমি তোমাকে সাহায্য করব।"

এই প্রথমবার মেয়েটা একটু হাসল, এত সুন্দর মেয়েটা হাসলে আরও অনেক সুন্দর লাগার কথা, কিন্তু মেয়েটির হাসিটি ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। হঠাৎ করে রাজুর কেন জানি ভয় করতে থাকে। মেয়েটা তার মুখে হাসিটা ধরে রেখে বলল, "তুমি আমাকে একটা ব্লেড কিনে এনে দেবে?"

"ব্লেড!" রাজু হতবাক হয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, "ব্লেড?"

"হ্যাঁ, আমার কাছে কোনো পয়সা নেই, থাকলে তোমাকে দিতাম। তুমি নিজের পয়সা দিয়ে কিনে আনবে। ঠিক আছে?"

রাজু কয়েক মুহূর্তে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থেকে ভয়ে ভয়ে বলল, "তুমি ব্লেড দিয়ে কী করবে?"

মেয়েটা তার হাতের কবজির কাছের অংশটায় আরেক হাত দিয়ে পোঁচ দেওয়ার মতো করে দেখিয়ে বলল, "এইখানে যে-রগটা আছে সেটা কেটে ফেলব।"

এত সহজ স্বরে কেউ যে-রকম একটা কথা বলতে পারে নিজের কানে না শুনলে রাজু কখনও বিশ্বাস করত না। সে হঠাৎ শিউরে ওঠে, একধরনের আতঙ্ক এসে তার উপর ভর করে। সে মেয়েটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, তখনও সে কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে সে বলল, "তুমি এরকম বলছ কেন?"

মেয়েটা কোনো কথা না বলে আবার হাসল, আর সে-হাসি দেখে রাজু আবার শিউরে উঠল, কোনোমতে বলল, "তুমি বলো তোমার কী হয়েছে, তোমার কী বিপদ? আমরা তোমাকে সাহায্য করব।"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, "আমাকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না। কেউ না।"

"কেন এরকম বলছ? তোমাকে কে আটকে রেখেছে? তুমি আমাকে বলো, আমি পুলিশকে গিয়ে বলব।"

"পুলিশকে বলবে?"

"হ্যাঁ। পুলিশ যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে আমি বড় একজন মানুষকে নিয়ে যাব, পুলিশ তখন বিশ্বাস করবে। কে তোমাকে এখানে আটকে রেখেছে?"

মেয়েটা কোনো কথা না বলে বিচিত্র একটা দৃষ্টিতে রাজুর দিকে তাকিয়ে রইল। রাগ অভিমান দুঃখ হতাশা সবকিছু মিলিয়ে সেটি ভয়ংকর একধরনের দৃষ্টি। রাজু আবার জিজ্ঞেস করল, "কে?"

মেয়েটা একটা বিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার বাবা।"

রাজু বিস্ফারিত চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার বাবা?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার নিজের বাবা?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল। রাজু খানিকক্ষণ হতবুদ্ধির মতো মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে কিছুই বুঝতে পারল না—একজন বাবা তার মেয়েকে কেন ধসে-যাওয়া একটা বাড়িতে তালা মেরে বন্ধ করে রাখবে! সে মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাবা কেন তোমাকে আটকে রেখেছে? তোমার মা কোথায়? তোমার মা কেন কিছু বলে না?"

"আমার মা জানে না আমি কোথায়। বাবা আমাকে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে। জোর করে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে।" মেয়েটা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার মা নিশ্চয়ই এতদিনে পাগল হয়ে গেছে।"

"তোমার বাবা কেন তোমাকে ধরে এনেছে?"

"আমার দাদা ছিল বড় রাজাকার। আমার বাবাও সেরকম। আবার বাবা মনে করে মেয়েদের সবসময় ঘরের ভিতরে থাকতে হয়। তাদের পড়াশোনা করতে হয় না। তাদের যদি বাইরে বের হতে হয় তা হলে বোরখা পরে মুখ ঢেকে বাইরে যেতে হয়, নাহয় সেইসব মেয়ে দোজখে যায়। আবার বাবা আমাকে মনে হয় খুব ভালোবাসে—একেবারে চায় না আমি দোজখে যাই।"

মেয়েটা হঠাৎ শব্দ করে হেসে ফেলল। রাজু অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকে, সে কি সত্যিই বলছে, নাকি ঠাট্টা করছে?

"আমার বাবা আমার মাকে দুচোখে দেখতে পারে না। মাকে এত ঘেন্না করে যে তুমি চিন্তাও করতে পারবে না। তাই বাবা ঠিক করেছে আমার মাকে শাস্তি দেবে—এত কঠিন শাস্তি যেন মা জীবনেও সেই শাস্তির কথা ভুলতে না পারে।"

"কী শাস্তি? তোমাকে মেরে ফেলবে?"

"ধুর! সেটা কি বড় শাস্তি হল?"

"তা হলে?"

"আমার বাবা আমার জন্য বিয়ে ঠিক করেছে। এইখানে কোনো গ্রামে থাকে অনেক বড় মোল্লা। আগের কয়েকটি বউ আছে। তার সাথে আমার বিয়ে দেবে—"

"বিয়ে! তোমার! তোমার?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল।

রাজু হতভম্বের মতো বলল, "তুমি তো এত ছোট!"

"যত ছোট হয় তত ভালো। তা হলে তাদের মনটাকে তাদের জামাইরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বদলে দিতে পারে। ওই মোল্লার বাড়িতে খুব কঠিন পর্দা, আমি কোনোদিন

সেখান থেকে বের হতে পারব না। আমার মা কোনোদিন জানতেও পারবে না আমি কোথায়। আমাকে খুঁজে খুঁজে পাগল হয়ে যাবে, আর আমার বাবা খুশিতে হা হা করে হাসবে।" মেয়েটা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমার বাবা আসলে একটা পিশাচ। আমার দাদাও পিশাচ ছিল-আমার বাবাও পিশাচ। আমরা পিশাচের বংশ।"

রাজু ছটফট করে উঠে বলল, "কিন্তু পুলিশকে বললে পুলিশ এসে তোমাকে উদ্ধার করবে। তোমার মতো ছোট একটা মেয়েকে জোর করে বিয়ে দিতে পারবে না। কোনোদিনও পারবে না।"

"তোমাকে বলেছি না আমার দাদা যেরকম রাজাকার ছিল আমার বাবাও সেরকম রাজাকার? মিডল ইস্ট থেকে বাবার কাছে বস্তা বস্তা টাকা আসে আর আমার বাবা সেই টাকা থেকে বস্তা বস্তা টাকা পুলিশকে দেয়। পুলিশ কখনও বাবাকে কিছু করবে না। কোনো বাবা যদি নিজের মেয়েকে তার সাথে রাখে সেটা কি দোষের কিছু?"

রাজু কী বলবে বুঝতে পারল না। কিছু-একটা বলতে গিয়ে আবার সে থেমে গেল।

মেয়েটা রাজুর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে নরম গলায় বলল, "কয়দিন থেকে আমার খুব মন-খারাপ ছিল। আজকে সকালে আমার হাত থেকে একটা গ্লাস পড়ে ভেঙে গেল, ভাঙা কাচ দেখে আমার হঠাৎ মনে হল, আরে, আমি কেন মন-খারাপ করছি! কাচ দিয়ে ঘ্যাঁচ করে হাতের একটা রগ কেটে দেব। কাত করে রাখলে কালির বোতল থেকে যেরকম সব কালি বের হয়ে যায় সেরকম আমার শরীরের সব রক্ত বের হয়ে যাবে। আমার বাবা তাঁর জামাইকে নিয়ে এসে দেখবে তার মেয়ে মরে পড়ে আছে। ভেবেছিল মেয়েকে জোর করে বেহেশতে পাঠাবে, কিন্তু পারবে না, দেখবে মেয়ে দোজখে চলে গেছে। তুমি জান কেউ আত্মহত্যা করলে সে দোজখে যায়?"

রাজু আর সহ্য করতে পারল না, জানালার শিক ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তুমি চুপ করো, এভাবে কথা বোলো না।"

"কেন বলব না? সেই থেকে আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে, আমি আর হাসি থামাতে পারছি না। নীচের টুকরোটি দিয়ে একটু কেটে দেখেছি, এই দ্যাখো—"

মেয়েটা তার হাত বাড়িয়ে দেয়, সত্যি সত্যি কবজির কাছে খানিকটা কাটা, রক্ত জমে আছে। মেয়েটা খুশি-খুশি গলায় বলল, "বাবা ভেবেছিল সে মাকে শিক্ষা দেবে—উলটো আমি বাবাকে শিক্ষা দিয়ে দেব!"

মেয়েটা হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, "শুধু একটা সমস্যা। কাচের টুকরো দিয়ে কাটতে খুব ব্যথা লাগে, ব্লেড হলে কী সুন্দর একবারে ঘ্যাঁচ করে কেটে দেওয়া যাবে—তুমি দেবে তো আমাকে একটা ব্লেড এনে? বলো দেবে—"

"না—" রাজু মাথা নাড়ল, "আমি তোমাকে ব্লেড এনে দেব না। আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব। তোমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাব।"

মেয়েটা কোনো কথা না বলে অবাক হয়ে রাজুর দিকে তাকিয়ে রইল আর হঠাৎ মেয়েটির অপূর্ব সুন্দর দুটি চোখ গভীর বিষাদে ভরে গেল। রাজু দেখল মেয়েটির চোখ হঠাৎ পানিতে ভরে উঠেছে আর সেটা দেখে রাজুর বুকের ভিতরে হঠাৎ এত কষ্ট হতে থাকে যে সেটা বলার মতো নয়। সে জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মেয়েটার মাথায় হাত দিয়ে বলল, "তুমি মন-খারাপ কোরো না। আমি তোমাকে যেভাবে পারি এখান থেকে নিয়ে যাব। খোদার কসম বলছি!"

মেয়েটা ফিসফিস করে বলল, "তুমি পারবে না রাজু। কিন্তু তুমি যে বলেছ সেটা শুনেই আমার এত ভালো লাগছে! আমার চারপাশে এখন শুধু খারাপ মানুষ—এত খারাপ যে তুমি চিন্তা করতে পারবে না। তোমাকে যদি ধরতে পারে তা হলে আমার যত বড় বিপদ তোমার তার থেকে আরও বড় বিপদ হয়ে যাবে।"

"হোক। আমি ভয় পাই না। তুমিও ভয় পেয়ো না। যেভাবে হোক আমরা তোমাকে বাঁচাব—"

ঠিক এরকম সময় হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা শিসের, শব্দ শুনতে পেল। রাজু বাইরে তাকায়, দেয়ালের পাশে আগুনালি দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কিছু-একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে। রাজু সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়াল, মেয়েটিকে বলল, "আমাকে এখনই যেতে হবে, "কেউ-একজন আসছে।"

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলল, "যাও। তাড়াতাড়ি যাও।"

রাজু এক পা গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, "তোমার নাম কী?"

"আমার মা আমাকে ডাকে শাওন। আমার বাবা ডাকে ফারজানা।"

"আমি তোমাকে তা হলে শাওন ডাকব।"

"ঠিক আছে।"

রাজু একটু হাসার ভঙ্গি করে দ্রুত কার্নিস বেয়ে ছুটে যেতে থাকে।

কিছুক্ষণের মাঝেই আগুনালি আর সাগরকে নিয়ে রাজু যখন জঙ্গলের মাঝে লুকিয়ে যাবার জন্যে ছুটে যাচ্ছিল, ঠিক তখন একটা মাইক্রোবাস নাহার মঞ্জিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। মাইক্রোবাসের দরজা খুলে একটা দীর্ঘকায় মানুষ নামল। মানুষটির চেহারা সুন্দর, ফরসা মুখে কালো চাপদাড়ি। চেহারায়, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একধরনের আভিজাত্যের চিহ্ন রয়েছে, দেখে একধরনের সম্ভ্রম জেগে ওঠে।

জঙ্গলে গাছের ফাঁক দিয়ে মানুষটিকে দেখে রাজুর ভিতরে অবশ্য কোনো সম্ভ্রমবোধ জেগে উঠল না, মানুষটি শাওনের বাবা, কেউ তাকে বলে দেয়নি, কিন্তু তবুও তার বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না।

শাওনের বাবা যতক্ষণ পর্যন্ত না ভিতরে ঢুকে গেল ততক্ষণ রাজু, সাগর আর আগুনালি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। একেবারে ভিতরে ঢুকে যাবার পর তিনজন চুপিচুপি গাছের আড়ালে আড়ালে বের হয়ে রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে। হেঁটে হেঁটে বেশ অনেক দূর সরে যাবার পর রাজু তার মুখ খুলল।

রাজুর মুখে পুরো ঘটনাটা শুনে আগুনালি চুপ মেরে যায়, এরকম একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে সে বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারছিল না। শাওনের দুঃখে সাগরের চোখে একেবারে পানি এসে যায়, সে সাবধানে চোখ মুছে বলল, "আমরা এখন কী করব ভাইয়া?"

"শাওনকে উদ্ধার করতে হবে।"

"কেমন করে উদ্ধার করবে?"

রাজু মাথা চুলকে বলল, "এখনও ঠিক করিনি। চল বাসায় গিয়ে দেখি মামা এসেছে কি না। মামা চলে এলে সবচেয়ে ভালো হয়, তা হলে মামা কিছু-একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।"

বাসায় এসে দেখল মামা তখনও আসেননি, বারান্দায় টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে হোটেলের ছেলেটা বসে আছে। খাবার দেখে হঠাৎ তিনজনের একসাথে খিদে লেগে

গেল। রাজু চাবি বের করে তালা খুলে ভিতরে ঢুকে তালাটা টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে থেমে গেল। হঠাৎ তার একটা জিনিস মনে হয়েছে, মানুষ কোনো ঘরের তালা খুলে সবসময় তালাটা কি ভিতরে নিয়ে আসে? তা-ই যদি হয় তা হলে সে একটা জিনিস করতে পারে—শাওনকে এই তালাটা দিতে পারে, যখন তার বাবা তালা খুলে ভিতরে ঢুকে তালাটা কোথাও রাখবে, শাওন কোনোভাবে তালাটা পালটে দেবে। তার বাবা কিছু জানবে না, আবার তাকে যখন তালা মেরে রেখে যাবে তখন এই তালাটা দিয়ে তালা মেরে যাবে। যখন আবার বাসায় কেউ থাকবে না তখন রাজুরা গিয়ে তালা খুলে শাওনকে বের করে নিয়ে আসবে।

পুরো ব্যাপারটা রাজু চিন্তা করে দেখে, যদি শাওন তালাটা পালটে দিতে পারে তা হলে বুদ্ধিটা কাজ না করার কোনো কারণ নেই। সে ঘুরে আগুনালির দিকে তাকাল। আগুনালি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"শাওনকে এই তালাটা দিতে হবে।"

"কেন?"

রাজু তখন পুরো বুদ্ধিটা খুলে বলল, শুনে আগুনালি মাথা নেড়ে বলল, "ফাস্ট ক্লাস বুদ্ধি, ফাস্ট ক্লাস!"

রাজু তখনও নাক-মুখ কুঁচকে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। যদি এই বুদ্ধিটা কাজ না করে তা হলে অন্য বুদ্ধি খুঁজে বের করতে হবে।

টিফিন-ক্যারিয়ার হতে ছেলেটা টিফিন-ক্যারিয়ারটা টেবিলের ওপরে রেখে দেয়। রাজু রান্নাঘরে গিয়ে কিছু থালাবাসন নিয়ে এসে খেতে বসে।

খাবারে এখনও অনেক ঝাল—মাছের টুকরো, আলু ভালো ধুয়ে নিতে হল। খেতে খেতে একটু পরেপরেই রাজুর শাওনের কথা মনে পড়ল। বেচারি একা একা ঐ বাসাটায় আটকা পড়ে আছে কে জানে তাকে ঠিক করে খেতে দিচ্ছে কি না!

দুপুরে খাবারের পর রোজ তাদের একটু আলসেমি লাগে, সোফায় কিংবা বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। আজ অবিশ্যি সেরকম কিছুই হল না, তারা তিনজনই এত উত্তেজিত হয়েছিল যে, একবারও বিশ্রাম করার কথা মনে পড়ল না। বাইরের বারান্দায় তিনজন হাঁটাহাঁটি করতে করতে কীভাবে শাওনকে ছুটিয়ে আনা যায় সেটা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা সোজা নয়, বড় কোনো মানুষের সাহায্য না নিয়ে কীভাবে এটা করা যায় সেটা ভেবে তারা কোনো কূলকিনারা পেল না। সাগর একটু পরে-পরে বলতে লাগল মামার বন্দুকটা নিয়ে গিয়ে গুলি করে শাওনের বাবার বারোটা বাজিয়ে দিতে—সেটা বলা খুব সহজ, কিন্তু বন্দুক দিয়ে সত্যি সত্যি কি আর কাউকে গুলি করা যায়? আজগর মামা সাগরকে যে খেলনা-পিস্তলটা দিয়েছেন সেটা বরং আরও ভালো অস্ত্র, সেটা দিয়ে ভয় দেখানো সোজা। সত্যি সত্যি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে আগুনালি তার আগুনি পাখুনি নিয়ে আসতে পারে, মুখের উপর আগুনের হলকা ছুড়ে দিলে মানুষ সাধারণত বাপ-বাপ করে পালায়।

কী করা যায় সেটা নিয়ে রাজু, আগুনালি আর সাগর আরও ভাবনাচিন্তা করতে লাগল। ঠিক হল বিকেলবেলায় দিকে তারা বের হবে। তার আগে আগুনালি বাড়ি যাবে তার নানারকম অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে আসতে। কিছু নূতন জিনিস তৈরি করার জন্যে কিছু কেনাকাটা আছে, সেজন্যে রাজু তাকে বেশকিছু টাকা ধরিয়ে দিল। আগুনালি ঠিক নিতে চাচ্ছিল না, কিন্তু এখন এসব ব্যাপার নিয়ে আর ভদ্রতা করার সময় নেই।

সারা দুপুর রাজু বারান্দায় বসে বসে চিন্তা করে কাটাল। যেভাবেই সে চিন্তা করে, কোথাও কোনো কূলকিনারা পায় না। রাজু প্রথমবার আজগর মামার অভাব সত্যিকারভাবে অনুভব করে। যদি এখন আজগর মামা থাকতেন কী সহজেই-না পুরো সমস্যাটার সমাধান করে দিতে পারতেন, তাদের কিছুই চিন্তা করতে হত না। কিন্তু এখন তাদের কিছুই করার নেই—নিজেরা নিজেরা গিয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করতেই হবে। যদি ধরা পড়ে যায় তখন কী হবে? শাওন বলেছে তার বাবা নাকি ভয়ংকর মানুষ—রাজাকাররা সবসময় ভয়ংকর হয়। একাত্তর সালে সব প্রফেসর ডাক্তারদের নিয়ে ধরে ধরে মেরে ফেলেছিল। যারা প্রফেসর ডাক্তারদের মেরে ফেলতে পারে তারা হয়তো বাচ্চা ছেলেদেরও মেরে ফেলতে পারে। যদি তাদের ধরে ফেলে তখন কী হবে? সাগরকে যদি ধরে ফেলে? রাজু হঠাৎ শিউরে উঠল।

বিকেলবেলা আগুনালি এসে দেখে রাজু বারান্দায় চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ করে বসে আছে। সে রাজুকে খুব বেশি বার গভীরভাবে চিন্তা করতে দেখেনি, তাই তার মুখ দেখে ঘাবড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "রাজু, তোমার শরীর খারাপ করেছে?"

রাজু চমকে উঠে আগুনালিকে দেখে বলল, "না! শরীর খারাপ হবে কেন?"

"মুখ দেখে মনে হল—"

সাগর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে মুখ বাঁকা করে বলল, "ভাইয়া সবসময় মুখ এরকম করে রাখে।"

রাজু রেগে কিছু-একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল—এখন এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে রাগারাগি করার সময় নেই। সে আগুনালির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের তালাটা নিয়ে ভিতরে ঢুকতে হবে, এ ছাড়া কোনো উপায় নেই।"

"কীভাবে ঢুকবে? দারোয়ানটা যদি থাকে?"

"কোনোভাবে দারোয়ানটাকে দরজা থেকে সরাতে হবে।"

"কীভাবে সরাব?"

"তুমি তোমার আগুন দিয়ে কিছু-একটা কায়দা-কানুন করতে পারবে না?"

আগুনালি এক মুহূর্ত চিন্তা করে দাঁত বের করে হেসে বলল, "একশো বার। এমন কায়দা করব দারোয়ানের বারোটা বেজে যাবে!"

সাগর চোখ বড় বড় করে বলল, "কী করবে তুমি?"

"চলো, দেখবে সময় হলে।"

তিনজনের ছোট দলটা আবার রওনা দেয় নাহার মঞ্জিলের দিকে। আগুনালির হাতে একটা বাজারের ব্যাগ, তার মাঝে আগুন লাগানোর নানা ধরনের জিনিসপত্র, কখন কোনটা কাজে লাগবে জানা নেই, তাই পুরো ব্যাগটাই সাথে নিয়েছে। রাজুর পকেটে বাসার তালাটা। মামার আলমারির তালাটা বাসার দরজায় লাগিয়ে এসেছে। তালাটা ছোট, মামার বাসায় চোর-ডাকাত এলে মনে হয় ধমক দিয়েই এ-তালাটা খুলে ফেলতে পারবে, কিন্তু এখন সেটা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই।

তিনজন হেঁটে হেঁটে যখন নাহার মঞ্জিলের কাছে এসে পৌঁছেছে তখন সন্ধে হয়-হয় করছে। আগুনালি তার ব্যাগটা একটা গাছের গোড়ায় রেখে সেখান থেকে কিছু ন্যাকড়া বের করে একটা লাঠির আগায় প্যাঁচাতে থাকে। তারপর সেটার মাঝে কয়েক ধরনের তেল ঢালে, কোনটা কেরোসিন কোনটা পেট্রোল কোনটা তার্পিন—কোনটা দিয়ে কী হবে

সেটা শুধুমাত্র আগুনালিই জানে। তারপর ছোট ছোট বোতলে নানারকম জিনিসপত্র ঢেলে ন্যাকড়া ঢুকিয়ে একধরনের বোমার মতো তৈরি করল। সাথে তার বিখ্যাত আগুনি পাথুনি এবং অনেকগুলি ম্যাচ নিয়ে রওনা হল। ঠিক করা হল আগুনালি দারোয়ানকে বাসার বড় দরজা থেকে সরিয়ে নেয়ামাত্রই রাজু শুট করে ভিতরে ঢুকে পড়বে। সাগরও গোঁ ধরল সে রাজুর সাথে ভিতরে যাবে, তাকে অনেক কষ্টে শান্ত করা হল, বলা হল শাওনকে উদ্ধার করে আনার পর তার ওপর ভার দেওয়া হবে শাওনকে চোখে-চোখে রাখার। রাজু আর আগুনালি এমন একটা ভাব করল যে, সেই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপুর্ণ এবং সাগরের মতো একজন মানুষ ছাড়া সেই কাজটা করা সম্ভব হবে না। শেষ পর্যন্ত সাগর রাজি হল।

আগুনালি তার জিনিসপত্র নিয়ে সাবধানে নাহোর মঞ্জিরের দিকে হাঁটতে থাকে, বাসার সামনে মাইক্রোবাসটা নেই, তার মানে শাওনের বাবা আবার চলে গেছে। এখন হয়তো শুধু দারোয়ানটাই আছে বাসার সামনে। ব্যাপারটা তা হলে সহজই হওয়ার কথা।

আগুনালি গিয়ে বন্ধ দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে থাকে, প্রায় সাথে সাথেই দারোয়ানটা বের হয়ে আসে। আগুনালিকে দেখে মানুষটা খেঁকিয়ে উঠল। আগুনালি অবিশ্যি মোটেও ঘাবড়ে গেল না, গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল, "দুপুরে আমি একটা গোরু এনেছিলাম, সেটা দেখেছেন?"

আগুনালির কথা শুনে মানুষটা যত রাগ হল তার থেকে অবাক হল আরও বেশি। আগুনালিকে ধরে প্রায় মার দেয়-দেয় অবস্থা—হাত তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তোর গোরু আমি কোলে তুলে রেখেছি? বাসার ভিতরে মানুষ গোরু খোঁজ করে শুনেছিস কোনোদিন?"

আগুনালি উদাস গলায় বলল, "ভাঙা বাড়ি, কোনো ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেছে কি না কে জানে!"

মানুষটা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হঠাৎ আগুনালি জিজ্ঞেস করল, "ম্যাচ আছে?"

"ম্যাচ? ম্যাচ দিয়ে কী করবি?

"কাজ ছিল—বলে আগুনালি নিজের পকেটে ম্যাচ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ করে ম্যাচটা পেয়ে যায়। সে ভিতর থেকে একটা কাঠি বের করে এক হাতেই কাঠিটা ফস করে জ্বালিয়ে উপরের দিকে ছুড়ে দেয়—কাঠিটা যখন নিচের দিকে নেমে আসছে সে তার হাতের মশালটা এগিয়ে দেয়—সাথে সাথে দপ করে মশালটা জ্বলে ওঠে। মশালটা সে কী দিয়ে তৈরি করেছিল কে জানে, কিন্তু সেটা একটা ছোট বিস্ফোরণের মতো শব্দ করে বিশাল একটা আগুনের কুণ্ডলী তৈরি করে দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করল। দারোয়ান মানুষটা ভয়ে চিৎকার করে পিছনে সরে গেল সাথে সাথে।

আগুনালি ইচ্ছে করে সেই বিশাল আগুনটি লোকটির নাকের ডগার কাছে ধরে রাখে, মানুষটা কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এখানে?

"আগুন জ্বালালাম।"

"কেন আগুন জ্বালছিস এখানে?"

"অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে—তাছাড়া গোরুটা কোথায় গেল, অন্ধকারে রাস্তা-না হারিয়ে ফেলে!"

মানুষটা খেঁকিয়ে উঠে বলল, "দূর হ এখান থেকে! দূর হ! পাগলা কোথাকার—"

আগুনালি দারোয়ানটার গালিগালাজে কান দিল না, খুব ধীরেসুস্থে নিচে নেমে এসে অল্প কিছু দূর গিয়ে মাটিতে মশালটা গেঁথে দিয়ে পকেট থেকে তার বোমাটা বের করে

সলতের মতো জায়গাতে আগুন লাগিয়ে সে উপরের দিকে ছুড়ে দেয়। খানিকটা উপরে উঠে সেটা নিচে শব্দ করে পড়তেই দপ করে বেশ খানিকটা জায়গায় দাউদাউ করে আগুন লেগে যায়।

দারোয়ানটা এবারে বাসা থেকে নেমে আগুনালির দিকে চিৎকার করতে করতে তেড়ে গেল, "কী হচ্ছে, কী হচ্ছে এখানে?"

আগুনালি তার আগুনের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "আগুন! আগুন আমার বড় ভালো লাগে!"

মানুষটা দাঁত-কিড়মিড় করে বলল, "তোর আগুন আমি বের করছি, ব্যাটা পাগল কোথাকার—"

আগুনালি মশালটা হাতে তুলে নিতেই মানুষটা দাঁড়িয়ে গেল, যে অবলীলায় এত বড় বিশাল একটা আগুন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাকে একটু ভয় পেতে হয়।

রাজু দরজার দিকে তাকাল, মানুষটি দরজা থেকে নেমে নিচে চলে গেছে, তার দৃষ্টি এখন আগুনালির দিকে। এই সুযোগ যে শুট করে বাসার ভিতরে ঢুকে গেল। আগে একবার এসেছে, তাই কোনদিকে যেতে হবে জানে। আবছা অন্ধকার সিঁড়ি ধরে সে উপরে উঠতে উঠতে শুনতে পেল বাইরে বাসার দারোয়ানটা মুখ-খারাপ করে আগুনালিকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে।

দোতলায় একটু হেঁটেই শাওনের ঘরটা পাওয়া গেল। এখনও দরজায় তালা ঝুলছে। রাজু পকেট থেকে তালাটা বের করে মিলিয়ে দেখল। দেখতে হুবহু একরকম। দরজায় টোকা দেবে কি না ভাবল একবার, কিন্তু না দেওয়াই স্থির করে আগের বারের মতো কার্নিস ধরে হেঁটে যেতে শুরু করে। দিনের বেলায় যে-জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিল সেটা বন্ধ। রাজু জানালায় টোকা দিয়ে নিচু গলায় ডাকল, "শাওন!"

প্রায় সাথে সাথেই শাওন জানালা খুলে দেয়। আবছা আলোয় তাকে অন্য জগতের একজন মানুষের মতো মনে হচ্ছে। জানালার শিক ধরে উদ্ভাসিত হয়ে বলল, "তুমি আবার এসেছ?"

"হ্যাঁ শাওন। আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে এসেছি। বাইরে দারোয়ানকে আমার বন্ধু ব্যস্ত রেখেছে। সময় বেশি নেই।"

"কী জিজ্ঞেস করবে?"

"তোমার ঘরে যখন কেউ ঢোকে তখন বাইরের তালাটা কোথায় রাখে?"

"খেয়াল করে দেখিনি। শাওন খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, দাঁড়াও মনে পড়েছে, মনে হয় এনে টেবিলের উপরে রাখে—একবার দেখেছিলাম।"

"গুড! রাজু পকেট থেকে তালাটা বের করে শাওনের হাতে দিয়ে বলল, "এই তালাটা তোমার কাছে রাখো। পরের বার যখন কেউ তালা খুলে ভিতরে ঢুকবে তখন এই তালাটা পালটে দেবে যে মানুষটা বুঝতে না পারে। আমরা এসে তখন এই তালা খুলে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। পারবে?"

"জানি না।"

"তোমাকে পারতেই হবে।"

শাওন একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "দেখি পারি কি না।"

"তোমার ঘরের ভিতরে কখন মানুষ আসে?"

"এই তো একটু পরে খাবার আনবে। তারপর যখন আরও অনেক রাত হয় তখন একবার বের হতে দেয়—আমি তখন ছাদে একা একা হাঁটি।"

রাজু মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, আমরা দেখেছি।"

"দেখেছ?"

"হ্যাঁ তাই তো আমরা জানলাম তুমি এখানে আছ। প্রথমে অবিশ্যি ভেবেছিলাম তুমি ভূত।"

"ভূত?"

শাওনা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে। রাজু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, এরকম ভাবে থেকেও একজন মানুষ এত সুন্দর করে হাসতে পারে!

"তুমি যখন ছাদে হাঁট তুমি একা থাক?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সিঁড়িতে দারোয়ান বসে থাকে। আমার বাবা আসে কখনও কখনও।"

"রাত্রিবেলা তুমি ঘরে বাতি জ্বালাও না?"

"মাঝে মাঝে একটা হারিকেন দেয়, কিন্তু তখন জানালা বন্ধ রাখতে হয়, যেন বাইরে থেকে কেউ দেখতে না পারে।"

রাজু কোনো কথা বলল না, একজন মানুষকে অন্য মানুষ কীভাবে এত কষ্ট দিতে পারে? বাইরে দারোয়ান কী করছে কে জানে, কিন্তু এখন বের হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। রাজু নিচু গলায় ফিসফিস করে বলল, "শাওন, এখন যেতে হবে। তালাটা রেখো ঠিক করে। তুমি তালাটা পালটাতে পেরেছ কিনা সেটা বুঝব কেমন করে?"

"তোমাকে আবার আসতে হবে।"

"ঠিক আছে, আসব। যাই এখন।"

"সাবধানে থেকো।"

রাজু আবার কার্নিস বেয়ে হেঁটে এসে জানালা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল, তারপর পা টিপে টিপে সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে থাকে। বাইরে আগুনালি বেশ কয়েকটা আগুন তৈরি করে হাতে মশাল নিয়ে তার সামনে লাফালাফি করছে, আর দারোয়ানটা তাকে ধরার চেষ্টা করছে। অন্য যে-কোনো সময় এরকম একটা দৃশ্য দেখলে হাসিতে তার পেট ফেটে যেত, কিন্তু এখন সবকিছু নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে আছে যে হাসাহাসির অবস্থা নেই। রাজু খোলা দরজা দিয়ে বের হয়ে আসতেই আগুনালি তার লাফঝাঁপ বন্ধ করে দিল, তাকে নিশ্চয়ই বের হতে দেখেছে। আগুনালি বলল, "যাই আমার গোরু খুঁজে দেখি। ভেবেছিলাম এখানে একটা আগুন করব, কিন্তু করতে দিলেন না।"

"ভাগ ব্যাটা পাগল—"

"পাগল-ফাগল বলবেন না। বেশি ভালো হবে না কিন্তু—"

"কেন, কী করবি?"

"এই আগুনটা মুখের মাঝে ঠেসে ধরব, একেবারে জন্মের মতো মুখপোড়া বান্দর হয়ে যাবেন।"

"কী বললি?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? আসেন কাছে—" বলে আগুনালি লোকটার দিতে এগুতে থাকে-লোকটা কী করবে বুঝতে না পেরে পিছিয়ে আসে। আগুনালি হঠাৎ মশালটা মানুষটির দিকে ছুড়ে দিল, লাফিয়ে সরে যেতে গিয়ে মানুষটা খুব খারাপভাবে আছাড় খেয়ে পড়ল, আর সেই ফাঁকে আগুনালি এক দৌড়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রাজু আর সাগর একটা গাছের নিচে অপেক্ষা করছিল, আগুনালি ছুটে এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। তাদের একটু ভয় হচ্ছিল যে, মানুষটা বুঝি আগুনালির পিছুপিছু ছুটে

আসবে। কিন্তু ছুটে এল না, বেকায়দা আছাড় খেয়ে পড়ে খুব খারাপভাবে ব্যথা পেয়েছে। বাসার সামনের আগুনগুলি কোনোভাবে নিভিয়ে রাগে গজগজ করতে করতে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাসার ভিতরে ঢুকে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থেকে আগুনালি হাঁপাতে হাপাতে বলল, "ফাস্ট ক্লাস! তারপর রাজুর দিকে তাকিয়ে বলল, সবকিছু ঠিক ঠিক হয়েছে?"

"তা হয়েছে, কিন্তু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে।"

"কী ঝামেলা?"

"আমাকে আবার ঢুকতে হবে।"

"কেন?"

"যদি তালাটা বদলাতে পারে তা হলে খুলে শাওনকে বের করতে হবে না?"

"কিন্তু ঝামেলাটা কী?"

"শাওন বলেছে এই একটু পরেই নাকি দারোয়ান খাবার নিয়ে যাবে, তখনই যদি তালাটা বদলে দেয় তা হলে তো আমার ভিতরেই থাকা উচিত ছিল। শুধু শুধু বের হলাম। একবারে দুজনে মিলে বের হয়ে আসতে পারতাম।"

আগুনালি দাঁত বের করে হেসে বলল, "সেটা কোনো সমস্যা না, তুমি যতবার চাইবে ততবার আমি দারোয়ানকে দরজা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব। আমার উপর কী রকম রেগেছে দেখেছ? এখন আমাকে দেখলেই আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসবে।"

"যদি ধরে ফেলে?"

"কোনোদিন ধরতে পারবে না। দশ পা দৌড় দিলেই ব্যাটার দম ফুরিয়ে যাবে। শুধু যদি ধরে ফলে, আমার কাছে আছে আগুনি পাখুনি। এমন একটা দাগা দিয়ে দেব যে ব্যাটা জন্মের মতো সিধে হয়ে যাবে।"

রাজু গাছের আড়াল থেকে বাসার ভিতরে উঁকি মারার চেষ্টা করতে করতে বলল, "সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোনোরকম হৈচৈ না করে ঢোকা যায়। বারবার কিছু একটা হৈচৈ করলে সন্দেহ করা শুরু করতে পারে।"

"তা হলে কীভাবে ঢুকবে?"

"যখন মনে কর দারোয়ানটা উপরে শাওনের ঘরে খাবার নিয়ে যাবে তখন যদি আমি চুপিচুপি ঢুকে গিয়ে পাশের ঘরে লুকিয়ে থাকি?"

সাগর ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "যদি দেখে ফেলে?"

"দেখবে কেন? দেখবে না। আমি লুকিয়ে থাকব। তবু যদি দেখে ফেলে তা হলে দৌড় দেব। যদি ধরে ফেলে তা হলে আগুনালি তার আগুনি পাখুনি নিয়ে আসবে বাঁচানোর জন্য। কী বল?"

আগুনালি মাথা নাড়ল, একবার দারোয়ান মানুষটিকে ঘোল খাইয়ে তার সাহস অনেক বেড়ে গেছে—সে এখন কোনোকিছুতেই আর ভয় পায় না। রাজুকে বলল, "তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি লোকটা কী করছে, যদি দেখি খাবার নিয়ে ওপরে যাচ্ছে তা হলে ইঙ্গিত করব, তুমি তখন চলে এসো।"

রাজু বলল, "তোমার জানালার কাছে যেতে হবে না, এখান থেকেই দেখা যাবে, আমাদের কাছে বাইনোকুলার আছে না?"

"তাই তো! মনেই থাকে না আমার।"

রাজু চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দেয়, প্রথমে মনে হয় বেশি অন্ধকার, কিছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ দারোয়ানটা স্পষ্ট হয়ে যায়, উবু হয়ে বসে বসে কিছু-একটা করছে। দারোয়ানটা উঠে দাঁড়াল, হাতে একটা ট্রে—তার মাঝে পানির গ্লাস,

একটা প্লেট-তার মাঝে ভাত, সাথে একটা ছোট বাটি। দেখে খুব একটা আহামরি খাবার বলে মনে হচ্ছে না। দারোয়ানটা ট্রে হাতে নিয়ে ভিতরের দিকে হেঁটে যেতে থাকে।

রাজু সাথে সাথে বাইনোকুলারটা আগুনালির হাতে দিয়ে বলল, "এক্ষুনি খাবার নিয়ে যাচ্ছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, তাকিয়ে দ্যাখো।"

আগুনালি বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে কিছু দেখতে পেল না। মানুষটা হেঁটে হেঁটে চোখের আড়ালে চলে গেছে। রাজু মাথা নেড়ে বলল, "আমি দেখেছি, ভিতরে গেছে।"

"তা হলে দেরি কোরো না, এক্ষুনি যাও। জানালা দিয়ে উঠতে পারবে তো?"

"মনে হয় পারব।"

"ভিতরে ঢুকে প্রথমে দরজাটা খুলে দেবে। চোরেরা যখন কোনো বাড়িতে চুরি করতে যায় তখন ভিতরে ঢুকে প্রথমেই পালিয়ে যাবার রাস্তাটা ঠিক করে।"

"আমি কি চুরি করতে যাচ্ছি?"

"চুরির মতোই। যাও।"

রাজু অন্ধকার গুঁড়ি মেরে বাসাটার দিকে ছুটে যেতে থাকে। জানালা গলে ভিতরে ঢুকতে বেশি অসুবিধে হল না, তবে দরজাটা খুলতে খুব কষ্ট হল। ছিটকিনিটা ওপরে এবং খুব শক্ত করে লাগানো ছিল। যখন সেটা খোলার চেষ্টা করছিল তখন শুধু হনে হচ্ছিল হঠাৎ বুঝি দারোয়ানটা এসে যাবে। রাজুর কপাল ভালো দারোয়ানটা এল না। শেষ পর্যন্ত ছিটকিনিটা খুলে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উপরে এসে শাওনের পাশের ঘরে লুকিয়ে গেল। শাওনের সাথে দারোয়ানটা কথা বলছে, তবে ঠিক কী নিয়ে কথা হচ্ছে কিছু বোঝা গেল না। শাওন মনে হল রেগেমেগে কিছু-একটা বলল, দায়োয়নটাও তার উপরে কিছু-একটা বলল, তারপর মনে হল শাওন আরও রেগে গেল। তারপর অনেকক্ষণ কোনো কথা নেই। কে জানে এখন হয়তো শাওন খাচ্ছে কিংবা মনের দুঃখে কাঁদছে। আসলে কী হচ্ছে বোঝার কোনো উপায় নেই এবং রাজুরও চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। রাজু তাই চুপচাপ বসে রইল। মশাদের মনে হয় রাজুকে পেয়ে খুব আনন্দ হল, পিনপিন করে তারা রাজুকে এসে ছেঁকে ধরল। শুধু মেয়ে-মশারা নাকি কামড়ায়, যদি ছেলে-মশারাও কামড়ানো শুরু করত তা হলে তো বিপদ ছিল। রাজু মশাকে থাবা দিয়ে মারতেও পারছিল না, নিঃশব্দে যে-কয়টাকে তাড়ানো যায় সে-কয়টাকে তাড়িয়ে কোনোমতে বসে থাকে। মশারা মনে হয় আস্তে আস্তে টের পেয়ে গেল রাজু কাউকে থাবা মারবে না এবং তাদের সাহস আস্তে আস্তে বেড়ে যেতে থাকে—একটা-দুইটা মশা নাকের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করল, অনেক কষ্ট করে তখন রাজুকে তার হাঁচি সামলে রাখতে হল।

এভাবে কতক্ষণ সে বসে ছিল তার খেয়াল নেই। সময়টা হয়তো খুব বেশি নয়, টেনেটুনে আধা ঘণ্টাও হবে না, কিন্তু তার মনে হল বুঝি অনন্ত কাল। শেষ পর্যন্ত পাশের ঘর থেকে দারোয়ানটা বের হয়ে দরজায় আবার তালা মেরে থালাবাসন নিয়ে নিচে নেমে গেল।

রাজু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে পা টিপে টিপে তার লুকানো জায়গা থেকে বের হয়ে আসে। খুব সাবধানে সে শাওনের ঘরের সামনে দাঁড়াল, কান পেতে শোনার চেষ্টা করল নিচে থেকে দারোয়ানটা আবার উপরে উঠে আসছে কি না। মানুষটা মনে হয় নিচেই আছে, থালাবাসন ধোয়াধুয়ি করছে। রাজু পকেট থেকে চাবি বের করে তালায় লাগাল, তার বুক ধুকধুক করছে, কে জানে শাওন তালাটা পালটাতে পেরেছে কি না!

চাবিটা ঘোরাতে তালাটা টুক করে খুলে গেল। রাজু নিশ্বাস বন্ধ করে খুব সাবধানে দরজার কড়াটা সরিয়ে সরজাটা খুলে ভিতরে উঁকি দিল। ঠিক দরজার সামনে বড় বড় চোখে শাওন দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে সত্যিই রাজু দরজা খুলে ঢুকেছে। শাওন কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল, রাজু তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করতে বলল। পা টিপে টিপে সামনে এগিয়ে ফিসফিস করে বলল, "চলো যাই।"

শাওন ফিসফিস করে বলর, "কেমন করে যাব?"

বাইরে গিয়ে ঠিক করব। চলো।"

শাওন দুই পায়ে এক জোড়া স্যাণ্ডেল পরে নিয়ে বলল, "চলো।"

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় রাজু দেখল একটা টেবিলের উপরে এক কাঁদি কলা। কলাগুলি দেখে হঠাৎ সে বুঝতে পারল তার অসম্ভব খিদে পেয়েছে। সে কলার কাঁদিটা হাতে তুলে নেয়। শাওন অবাক হয়ে বলল, "তোমার খিদে পেয়েছে?"

রাজু একটু লজ্জা পেয়ে গেল, বলল, "এই একটু।"

"তুমি দাঁড়াও, আমার কাছে বিস্কুটও আছে।"

"বিস্কুট লাগবে না।"

শাওন তবু কথা শুনল না, যে-কোনো মুহূর্তে দারোয়ান ওপরে চলে আসতে পারে জেনেও সে তার বিছানার ওপর থেকে একটা বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে এল। রাজু খুব সাবধানে দরজার পাল্লাটা একটু ফাঁক করে দেয়, তার ভিতর দিয়ে, প্রথমে রাজু এবং রাজুর পিছনে পিছনে শাওন বের হয়ে এল। রাজু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল তালাটা লাগবে না খোলা রাখবে, মনে হল লাগিয়ে রাখাই ভালো—ভিতরে নেই সেটা জানতে তা হলে সময় লাগবে বেশি। সে তালাটা লাগিয়ে দিল।

ঘর থেকে বের হয়েছে সত্যি, কিন্তু বাসা থেকে এখনও বের হয়নি। সেটা ঠিক কীভাবে করবে সে এখনও জানে না। আগুনালি যতক্ষণ পর্যন্ত একটা কায়দা-কানুন করে দারোয়ানকে দরজা থেকে না সরাচ্ছে, মনে হয় কিছু করার নেই। রাজু ফিসফিস করে বলল, "এই দিকে চলো, এখন লুকিয়ে থাকতে হবে।"

শাওন ফিসফিস করে বলল, "আমরা বের হব কেমন করে?"

এখনও ঠিক করিনি। রাজুও গলা নামিয়ে বলল, "বাইরে আমার বন্ধু আছে, সে ব্যবস্থা করবে।"

"এখন কী করব?"

"ভিতরে লুকিয়ে থাকতে হবে।"

"কোথায় লুকাবে?"

"চলো ঐ পাশে যাই।"

রাজু শাওনকে নিয়ে বাসার অন্য পাশে চলে এল। একটা ভাঙা দেয়ালের পাশে দুজন গুঁড়ি মেরে বসে। এখান থেকে বাইরে দেখা যায়, আগুনালি সাগরকে নিয়ে যে-জায়গায় অপেক্ষা করছে সেই জায়গাটাও মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। যখন সে তার আগুন নিয়ে কিছু-একটা কায়দা-কানুন শুরু করবে এখান থেকে সেটা খুব সহজে দেখা যাবে।

শাওন গলা নামিয়ে বলল, "তোমার কী মনে হয়? আমরা বের হতে পারব?"

রাজুর বুক ভয়ে ধুকধুক করছে কিন্তু সে সেটা বুঝতে দিল না, গলায় জোর এনে বলল, "একশো বার।"

"যদি না পারি?"

"না পারার কী আছে! সবচেয়ে কঠিন কাজটাই তো হয়ে গেছে!"

"কোনটা?"

"তোমার ঘরের তালা খুলে বের করে আনা।"

"তা ঠিক।"

রাজু অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কলার কাঁদিটা বের করে একটা কলা ছিলে খেতে খেতে বলল, "তুমি খাবে একটা?"

"না। আমি কলা দুচোখে দেখতে পারি না।"

"তা হলে বিস্কুট খাও।"

"না, আমার খিদে নেই।"

রাজু অন্ধকারে বসে বসে বিস্কুট আর কলা খেতে থাকে—তার নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছে না যে সে এরকম অবস্থায় বসে বসে খাচ্ছে! মানুষ ভয় পেলে মনে হয় খিদে পায় বেশি।

কয়েকটা কলা খেয়ে হঠাৎ রাজু উঠে দাঁড়াল। শাওন জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাও?

"এই কলার ছিলকেগুলি ফেলে আসি।"

"কোথায় ফেলবে?"

"তোমার জানালার নিচে কার্নিস। তোমার তালা খুলতে না পেরে দারোয়ান নিশ্চয়ই দেখার জন্যে কার্নিস ধরে জানালার দিকে যাবে। যখন জানালার কাছে যাবে তখন ধুড় ম করে আছাড় খেয়ে পড়বে।"

"সর্বনাশ! উপর থেকে পড়ে যদি মরে যায়?"

"মরবে না, বেশি উঁচু তো নয়। ব্যথা পাবে। পাওয়া দরকার।"

রাজু পা টিপে টিপে শাওনের পাশের ঘরে গিয়ে জানালা দিয়ে মাথা বের করে কার্নিসে কলার ছিলকেগুলি ছুড়ে ফেলল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ সেখানে এক ঝলক আলো এস পড়ল, আলোটা কোথা থেকে আসছে দেখার জন্যে সে মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই হঠাৎ করে একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল। সর্বনাশ! নিশ্চয়ই শাওনের বাবা এসেছে।

রাজু প্রায় ছুটে শাওনের কাছে ফিরে এল, শাওন উঁকি দিকে বাইরে দেখার চেষ্টা করছে। রাজুকে দেখে গলা নামিয়ে বলল, "আমার বাবা এসেছে! এখন কী হবে?"

রাজু নিজের ভয় লুকিয়ে রেখে বলল, "কী হবে, কিছু হবে না।"

দুজনে নিশ্বাস বন্ধ করে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। মাইক্রোবাসটা বাসার সামনে দাঁড়ানোর সাথে সাথে ড্রাইভার নেমে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দেয়। গাড়ির ভিতর থেকে শাওনের বাবা বের হয়ে এল। বাইরে সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। গাড়ির শব্দ শুনে দারোয়ানটাও বের হলে এল, মাথা নিচু করে লম্বা সালাম দিল, দু-একটা ছোট কথাবার্তাও বলল, কিন্তু ওপর থেকে ঠিক বোঝা গেল না, শুধুমাত্র ফারজানা নামটা কয়েকবার শোনা গেল। রাজুর হঠাৎ মনে পড়ল শাওনের বাবা তাকে ফারজানা বলে ডাকে।

শাওনের বাবা ড্রাইভারকে দু-একটা কথা বলে ভিতরে ঢোকে এবং প্রায় সাথে সাথেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণের মাঝেই শাওনের ঘরের সামনে এসে হাজির হবে—তারপর কী হবে? রাজুর বুকের ধুকপুকানি হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। সে ঢোক গিলে শাওনের দিকে তাকাল। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু শাওনের মুখও নিশ্চয়ই ফ্যাকাশে হয়ে আছে। শাওনকে না পেয়ে যদি এই বাসায় তাকে খুঁজতে থাকে তারা কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে?

রাজু আর শাওন শুনতে পেল শাওনের বাবা আর দারোয়ান ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে। দারোয়ান নিশ্চয়ই চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টা করে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে তালাটা খুলতে পারছে না। শাওনের বাবা বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হল?"

দারোয়ানটা খুব অবাক হলে বলল, "তালাটা খোলা যাচ্ছে না।"

"খোলা যাচ্ছে না মানে? ঠিক চাবি ঢুকিয়েছিস?"

"জি, ঠিকটাই ঢুকিয়েছি, এই দেখেন।"

"দেখি, আমার কাছে দে।"

এবারে নিশ্চয়ই শাওনের বাবা খুলতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সেও খুলতে পারছে না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হঠাৎ মানুষটা রেগে উঠে বলল, "ব্যাটা উল্লুক, তুই নিশ্চয়ই ভুল চাবি ঢুকিয়ে তালাটা নষ্ট করেছিস।"

"না হুজুর, আমি ভুল চাবি ঢুকাই নাই—"

"চুপ করে শুয়োরের বাচ্চা! বেতমিজ!"

গালি খেয়ে দারোয়ান মানুষটা একেবারে চুপ করে গেল, আর কোনো কথা বলল না। শাওনের বাবা এবারে শাওনকে ডাকল, "ফারজানা!"

শাওন হঠাৎ চমকে উঠে রাজুর হাত চেপে ধরল। রাজু ফিসফিস করে বলল, "ভয় পেয়ো না।"

শাওনের বাবা আবার গলা উঁচিয়ে ডাকল, "ফারজানা! দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে এবারে ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠল, "ফা-র-জা-না!"

শাওন আবার চমকে উঠে রাজুকে শক্ত করে ধরে রাখল। মেয়েটা কী অসম্ভব ভয় পায় তার বাবাকে! রাজু আবার ফিসফিস করে বলল, "কোনো ভয় নেই শাওন, কোনো ভয় নেই—"

শাওনের বাবা এবার প্রচণ্ড জোরে দরজায় লাথি দিয়ে বলল, "কথা বল ফারজানা—"

ফারজানা কোনো কথা বলল না এবং হঠাৎ করে দারোয়ানটির দুর্বল গলা স্বর শোনা গেল, বলল, "হুজুর একটা কথা—"

"কী কথা?"

"আপা একটা কথা বলেছিলেন—"

"কী কথা?"

"বলেছিলেন গলায় দড়ি দেবেন—"

"কখন বলেছে?"

"এই তো মাঝে মাঝেই বলেছেন।"

শাওনের আব্বা কয়েক মুহূর্তে কোনো কথা বলল না, তারপর হঠাৎ ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "কী বলছিস তুই? সুইসাইড করেছে?"

"করতেও তো পারে! খুব মনের কষ্টে ছিলেন—"

দরজায় প্রচণ্ড জোরে লাথির শব্দ শোনা গেল। শাওনের আব্বা গলা উঁচিয়ে বলল, "ভাঙ দরজাটা। তাড়াতাড়ি।"

রাজু হঠাৎ বুঝতে পারে তার মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বেশি ভয় পেলে ব্যাপারটা কেন হয় কে জানে? এ-যাত্রা বেঁচে গেলে আজগর মামাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

রাজু শাওনের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "যখন দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে যাবে তখন আমরা এখান থেকে বের হয়ে দৌড় দেব।"

"দেখে ফেলবে না?"

"দেখলে দেখবে, কিছু করার নেই।"

রাজু আর শাওন নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থেকে শুনতে পায় শাওনের বাবা আর দারোয়ান দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। প্রত্যেকবার দরজায় লাথি দিতেই তাদের বুক কেঁপে উঠছিল। দরজাটা নিশ্চয়ই শক্ত, কারণ অনেক চেষ্টা করেও সেটা ভাঙতে পারল না। দারোয়ানটা বলল, "দরজার খুব শক্ত স্যার। গর্জন কাঠ দিয়ে বানিয়েছে, দুই পাল্লা দিয়েছে— একটা খন্তা হলে সুবিধে হত।"

"কথা না বলে একটা খন্তা নিয়ে আয়-না কেন?"

"এই বাসায় তো নাই হুজুর।"

"নাই? অন্যকিছু নাই?"

"জি না।"

"ড্রাইভারকে গিয়ে বল একটা খন্তা আনতে।"

"জি হুজুর।" দারোয়ান চলে যেতে যেতে ফিরে এসে বলল, "জানালা দিয়ে একবার দেখলে হয় না স্যার?"

"জানালা দিয়ে?"

"জি।"

"কেমন করে দেখবি?"

"এই পাশের ঘর থেকে কার্নিস ধরে যদি যাই।"

"যেতে পারবি?"

দারোয়ানটা বলল, "পারব হুজুর।"

"যা তা হলে।"

দারোয়ানটা নিশ্চয়ই কার্নিসের ওপর দিয়ে হাঁটা শুরু করেছে। কলার ছিলকেগুলি আছে, সত্যি কি কাজে লাগবে এখন? রাজু নিশ্বাস বন্ধ করে থাকে এবং হঠাৎ একটা বিকট আর্তনাদ, তারপর ধপাস করে কোনো মানুষের পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল। রাজু হাতে কিল দিয়ে বলল, "ভেরি গুড!"

শাওনের বাবা ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

বাইরে নিচে থেকে দারোয়ানটির কাতর গলায় স্বর শোনা গেল, কিছু-একটা বলছে, এখান থেকে ঠিক শোনা যাচ্ছে না। শাওনের বাবা ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "আহাম্মক কোথাকার! এখন মাজা ভেঙে আমাকে ঝামেলায় ফেলবি?"

রাজু আর শাওন কান পেতে থাকে, শাওনের বাবা সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই পিছনে গিয়ে দারোয়ানটকে দেখতে তার কী অবস্থা। ড্রাইভারও নিশ্চয়ই যাবে—এই সুযোগ!"

রাজু শাওনকে বলল, "চলো যাই।"

"এখন?"

"হ্যাঁ, যদি দেখে ফেলে ভয় পেয়ো না—চোখ বন্ধ করে দৌড়াবে। জঙ্গলে আমার জন্যে আগুনালি অপেক্ষা করছে—দরকার হলে ফাইট দেবে।"

শাওন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে অপেক্ষা করছে?"

"আমার বন্ধু আগুনালি। একটু পরেই দেখবে। চলো যাই।"

"চলো।"

কয়েক মুহূর্ত পরে দেখা গেল রাজু আর শাওন দরজা খুলে ছুটতে ছুটতে জঙ্গলের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

শাওনের নিশ্চয়ই দৌড়াদৌড়ি করে অভ্যাস নেই, জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে সে রাজুকে ধরে বড় বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "ওফ্, মারা যাচ্ছি একেবারে!"

রাজু খুশিতে হেসে ফেলে বলল, "না শাওন, তুমি আর মারা যাবে না। তোমাকে আমরা উদ্ধার করে এনেছি।"

রাজুর কথা শেষ না হতেই হঠাৎ করে আগুনালি আর সাগর হাজির হল। শাওন ভয়ে চিৎকার করতে গিয়ে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "কে? কে তোমরা?"

রাজু বলল, "ভয় নেই শাওন। এই হচ্ছে আগুনালি আর এই ছোটজন সাগর, আমার ভাই।"

সাগর বলল, "ভাইয়া বলেছে তুমি নাকি দেখতে খুব সুন্দর। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না।"

রাজু লজ্জা পেয়ে বলল, "চুপ কর গাধা!"

সাগর বলল, "তুমি বলনি? একশোবার বলেছ—"

আগুনালি রাজুকে উদ্ধার করল। বলল, "এখানে দেরি করে লাভ নেই, তাড়াতাড়ি চলো বাসায় যাই। যদি দেখে ফেলে বিপদ হবে।"

"হ্যাঁ, চলো যাই। রাজু মাথা নাড়ল, "চলো। যেতে যেতে তোমাদের বলি কী হয়েছে।"

আগুনালি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ওফ্! যা ভয় পেয়েছিলাম সে আর বলার মতো না! কাল সকালেই একটা মুরগি ছদকা দিতে হবে।"

সাগর জিজ্ঞেস করল, "মুরগি ছদকা দিলে কী হয়?"

"বিপদ কেটে যায়।"

"বিপদ তো এখন কেটে গেছে, এখন তা হলে কেন দেবে?"

রাজু বলল, "চুপ কর তো সাগর, খালি ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না।"

অবিশ্বাস্য ব্যাপার, সাগর সত্যি চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল দুটি কিশোর আর একটি শিশু অপূর্ব সুন্দরী একটা কিশোরীকে নিয়ে চাঁদের আলোতে হেঁটে যাচ্ছে। যেতে যেতে নিচু গলায় কথা বলছে রাজু। হঠাৎ করে তার মনে হচ্ছে সে বুঝি আর ছোট নেই, সে বুঝি অনেক বড় হয়ে গেছে। বুকের ভিতরে হঠাৎ সে আশ্চর্য একধরনের অনুভূতি অনুভব করতে থাকে, যার সাথে তার আগে কখনও পরিচয় হয়নি। চাঁদের আলোয় সে একটু পরেপরে শাওনের মুখের দিকে তাকায় আর সাথে সাথে আবার তার বুকের ভিতরে কেমন যেন করতে থাকে।

একটি মানুষ দেখতে এত সুন্দর কেমন করে হতে পারে!

৬. ষষ্ঠ দিন

রাতে অনেক দেরি করে ঘুমিয়েছে, কিন্তু রাজুর ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। বিছানায় তার পাশে সাগর মুখ হাঁ করে ঘুমাচ্ছে। পাশের বিছানায় ঘুমাচ্ছে আগুনালি। সে যতক্ষণ জেগে থাকে

ততক্ষণ হন্বিতম্বি করতে থাকে, কিন্তু ঘুমাচ্ছে গুটিসুটি মেরে একেবারে একটা বলের মতো হয়ে। শাওন পাশের ঘরে সোফার উপরে শুয়ে ঘুমিয়েছে। মশারি খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু কয়েকটা মশার কয়েল পাওয়া গিয়েছিল। কে জানে ঠিক করে ঘুমাতে পেরেছিল কি না!

রাজু বিছানা থেকে নেমে পাশের ঘরে উঁকি দিল। শাওন সোফায় নেই, প্রথমে বুকটা ধক করে ওঠে, কিন্তু পরের মুহূর্তে সে শান্ত হয়ে আসে। শাওন জানালার কাছে দুই গালে হাত দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। রাজু একটু শব্দ করে ঘরে ঢুকতে শাওন ঘুরে তাকাল। রাজুকে দেখে হেসে বলল, "তুমিও উঠে গেছ?"

"হ্যাঁ, তুমি কখন উঠেছ?"

"অনেক ভোরে।"

"মশার কামড় খেয়ে?"

"না, মশা কামড়ায়নি। এমনিতেই ঘুম ভেঙে গেল।"

ঘুম হয়েছে তোমার?"

শাওন আবার একটু হাসল, "হয়েছে। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙেছে, তখন হঠাৎ করে মনে পড়েছে আমি পালিয়ে চলে এসেছি—তখন যে কী মজা লেগেছে!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, ইচ্ছে হয়েছে উঠে ডিগবাজি দিই।"

একটা ফুটফুটে মেয়ে ঘুমাতে ঘুমাতে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে ডিগবাজি দিচ্ছে—দৃশ্যটা চিন্তা করে রাজু খিকখিক করে হেসে ফেলল।

শাওন আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "জায়গাটা কী সুন্দর!"

রাজু এগিয়ে গিয়ে শাওনের পাশে দাঁড়াল। দূরে ছোট ছোট টিলা, টিলার কাছে গাছের সারি, পুরো এলাকাটা একধরনের নরম কুয়াশার ঢেকে আছে। এখনও সূর্য ওঠেনি, আকাশে একটা লালচে ভাব এসেছে। বাইরে পাখিরা কিচিরমিচির করে ডাকছে, কে জানে, তাদেরও মনে হচ্ছে খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেছে।

শাওন বাইরে তাকিয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, যে—"

শাওন তার কথাটা শেষ করল না। রাজু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, "যে?"

"যে আমাকে মরতে হবে না!"

কথাটা শুনে রাজুর এত মায়া লাগল যে বলার নয়। সে নরম গলায় বলল, "মরবে কেন, ছি!"

"আমি একেবারে রেডি হয়েছিলাম—"

"থাক। এগুলো মনে করে আর লাভ নেই।"

"মরে গেল আর এত সুন্দর জায়গাটা দেখতে পারতাম না।"

"এখন তো দেখছ। সবাই ঘুম থেকে ওঠার পর নাস্তা খেয়ে আমরা ট্রেন স্টেশনে যাব। সেখান থেকে ট্রেনে করে ঢাকায় তোমার আম্মার কাছে। চিন্তা করো তোমার আম্মা কী খুশি হবেন!"

শাওন সাবধানে হাতের উলটো পিট দিয়ে চোখ মুছে বলল, "হ্যাঁ, বেচারি আম্মা! কী কষ্টটাই-না পাচ্ছে!"

"থাক, এখন আর দুঃখকষ্টের কথা ভেবে লাভ নেই। সকালে কী নাস্তা করবে বলো!"

"নাস্তা তৈরি করবে কে?"

"এই আমরা নিজেরাই তৈরি করব।"

"কী কী আছে তৈরি করার?"

রাজু মাথা চুলকে বলল, "বেশি কিছু নেই। মুড়ি আর বিচিকলা।"

শাওন হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে, কিছুতেই হাসি থামাতে পারে না। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে যায়। চোখ মুছে বলল, "মুড়ি আর বিচিকলা! তুমি যেভাবে জিজ্ঞেস করেছ শুনে মনে হল হাতি ঘোড়া কত কী খাবার আছে!"

রাজু একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "আসলে চান মিয়া তো এখনও আসেনি, সেজন্যে এই অবস্থা! আগুনালি অবিশ্যি চাও তৈরি করতে পারে, কিন্তু সেই চা খাওয়া যায় না।"

"কেন?"

"আলকাতরার মতো কুচকুচে কালো হয় আর খেতে একেবারে ইঁদুর মারার বিষের মতো।"

শাওন আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে আর তাকে হাসতে দেখে এবারে রাজুও প্রথমে একটু একটু, তারপর বেশ জোরে জোরে হাসতে শুরু করল।

সবাই যখন ঘুম থেকে উঠল তখন বাসটিতে একটা কর্মব্যস্ততার ভাব ফুটে উঠল। এই কয়দিনে বাসার নানা জায়গায় যেসব জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল শাওন সেগুলি গোছাতে শুরু করে এবং অন্য তিনজন অবাক হয়ে লক্ষ করল কিছুক্ষণের মাঝেই পুরো বাসার চেহারাটা পালটে গেছে। আগুনালি নাস্তা তৈরি করার দায়িত্ব নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল, রাজু গেল তাকে সাহায্য করতে। সাগর শাওনের পিছুপিছু ঘুরঘুর করে তার কাজকর্মে পদেপদে ঝামেলা করতে লাগল। রাজু হলে এতক্ষণে সাগরকে তুলে একটা আছাড় দিয়ে বসত, কিন্তু শাওন একটুও রাগ করল না। মনে হয় খোদা যখন মেয়েদের তৈরি করেছেন তখন তাদের শরীরে ধৈর্য প্রায় দশ কে. জি. বেশি দিয়েছেন।

সকালের নাস্তা খাওয়ার অনুষ্ঠানটি হল খুব চমৎকার। রাজু কাছে কাছে ছিল বলে এবারে আগুনালি চা-টা বেশি কড়া করতে পারল না এবং সেটা বেশ খাওয়া গেল। মুড়ি শেষ হওয়ার পর বিচিকলা মুখে দিয়ে পুট করে তার বিচি কে কতদূরে ছুড়ে দিতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় আগুনালিকে কেউ হারাতে পারল না। দেখে বড় প্রতিযোগী মনে না হলেও শাওন হল রানার্স আপ। সাগর অনেক চেষ্টা করার পরও তার বিচিগুলি মুখ থেকে বের হয়ে থুতনির মাঝে ঝুলে থাকতে লাগল। সেটা দেখে প্রথমে শাওন এবং শাওনকে দেখে অন্য সবাই হাসিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। যদিও সাগরকে নিয়ে সবাই হাসছে, কিন্তু সাগর তবুও এতটুকু রেগে গেল না, বরং সবাইকে এত আনন্দ দিতে পারছে বলে সে নিজেও হাসতে লাগল। নাস্তা শেষ হবার পর আগুনালি তার আগুনের খেলা দেখাল। তার আগুনি পাখুনি নিয়ে সে বিশাল একটা আগুনের হলকা শাওনের একেবারে কানের কাছে দিয়ে পাঠিয়ে দিল। শাওন প্রস্তুত ছিল না বলে ভয়ে চিৎকার করে রাজুকে জড়িয়ে ধরল, আর তাই দেখে অন্য সবাই হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে থাকে। শাওনকে অবাক করে দেবার জন্যে আগুনালি মুখে পেট্রোল নিয়ে আগুনের উপর দিয়ে ফুঁ দিয়ে বের করতেই মনে হল তার মুখ থেকে ড্রাগনের মতো আগুন বের হয়ে এল। সেটা দেখে শাওন এত ভয় পেল, যে চিৎকার দিতে পর্যন্ত ভুলে গেল। আগুনালি আবার সেটা দেখানোর চেষ্টা করতেই শাওন ছুটে গিয়ে আগুনালির হাত ধরে ফেলে বলল, "না না, তুমি এটা করতে পারবে না।"

আগুনালি দাঁত বের করে বলল, "ভয় পাবার কিছু নাই, এর মাঝে কোনো বিপদ নাই। মুখে পেট্রোলের গন্ধ খারাপ লাগে, কিন্তু কোনো বিপদ নাই।"

শাওন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "একশো বার আছে।"

"এইটা দেখেই ভয় পাও, আমার অন্য খেলা দেখলে তুমি কী করবে?"

"কী খেলা?"

"সারা শরীরে আগুন লাগিয়ে পানির মাঝে ঝাঁপ দেওয়া।"

শাওন ভয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে বলল, "তুমি শরীরে আগুন লাগিয়ে পানিতে ঝাঁপ দাও?"

"এখনও পুরো শরীরে লাগাই নাই। দুই হাতে লাগিয়ে প্র্যাকটিস করেছি। পেট্রোল দিয়ে আগুন দিতে হয়। পেট্রোল পুড়ে গেলে আগুন নিজে থেকে নিভে যায়, দেখে ভয় লাগে, আসলে ভয়ের কিছু নাই। তুমি দেখ নাই সার্কাসে দেখায়?"

শাওন মাথা নাড়ল, সে দেখেনি।

আগুনালি দাঁত বের করে হেসে বলল, "সেইজন্যে এত ভয় পেয়েছ। ভয়ের কিছু নাই। আগুনকে আমি খুব ভালো করে চিনি। তোমরা যদি আগুন নিয়ে খেল অনেক বিপদ হতে পারে, আমি যদি খেলি কোনো বিপদ নাই।"

শাওন থমথমে মুখে বলল, "তোমার যা ইচ্ছা তুমি বলতে পার, কিন্তু এখন আমাকে ছুঁয়ে তোমার একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

আগুনালি থতমত খেয়ে বলল, "কী প্রতিজ্ঞা?"

"আগে আমাকে ছোঁও।"

সাগর জিজ্ঞেস করল, "ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলে কী হয়?"

শাওন সাগরের দিকে তাকিয়ে বলল, "যদি প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেল তা হলে যাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছ সে মরে যায়। শাওন আবার আগুনালির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "ছোও। ছুঁয়ে আমার সাথে সাথে বলো—"

"কী বলব?"

"বলো, আমি জীবনে শরীরের কোনো জায়গায় আগুন লাগাব না—"

"কিন্তু—কিন্তু—"

"না। আমি কোনো কথা শুনব না। আমাকে ছুঁয়ে তোমার বলতে হবে। আমি কোনো কথা শুনব না। বলো—"

আগুনালি আরও কয়েকবার চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে শাওনকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে সে জীবনে কখনও নিজের শরীরে আগুন লাগাবে না। রাজুর ধারণা ছিল প্রতিজ্ঞাটা করার পর আগুনালির নিশ্চয়ই একটু মন-খারাপ হবে, কিন্তু দেখা গেল তার ঠিক মন-খারাপ হল না। একজন মানুষের তার জন্যে এত মমতা থাকতে পারে—ব্যাপারটা অনুভব করে হঠাৎ তার নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে লাগল।

আগুনালির খেলা শেষ হবার পর তারা কীভাবে ঢাকা ফিরে যাবে সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকে। আগুনালি বলল যে খুব ভোরে একটা ট্রেন ছিল, সেটা চলে গেছে। পরের ট্রেনটা দুপুরে। রাজু বলল, "আমাদের সেটাই ধরতে হবে।"

সাগর বলল, "যদি শাওন আপুকে চিনে ফেলে?"

"কে চিনে ফেলে?"

"শাওন আপুর আব্বা?"

হঠাৎ করে সবাই চুপ করে গেল। গত রাতে শাওনকে নিয়ে পালিয়ে আসার পর কী হয়েছে কেউ জানে না। তারা চলে আসার পর দরজাটা ভেঙে নিশ্চয়ই সবাই ভিতরে ঢুকেছে। যখন দেখেছে ভিতরে শাওন নেই তারা নিশ্চয়ই হতবাক হয়ে গেছে। তখন পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। দারোয়ানটা আগুনালিকে খুব ভালো করে দেখেছে, সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে আগুনালি বারবার নাহার মঞ্জিলে গিয়ে যে তার গোরু খোঁজাখুঁজি করেছে তার পিছনে আসলে অন্য উদ্দেশ্য ছিল। আগুনালিকে একবার দারোয়ানটা রাজু আর সাগরের সাথেও দেখেছিল। তখন সেটা দেখে হয়তো কিছু মনে করেনি, কিন্তু এখন নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। তারা একসাথে ঘোরাঘুরি করেছে, দুই মাথাওয়ালা গোরু দেখতে গিয়েছে, বাজারে রেস্টুরেন্টে ভাত খেয়েছে—তখন আবার আগুনালি সবাইকে বলে বেড়িয়েছে রাজু আর সাগর মাস্টার সাহেবের ভাগনে। কাজেই কেউ যদি ভালোভাবে খোঁজাখুঁজি শুরু করে তাদেরকে খুঁজে বের করতে কোনো সমস্যা হবার কথা না। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই জানতে পারবে না, এক-দুইদিন লেগে যাবার কথা। কিন্তু আর দেরি করে লাভ নেই—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকা চলে যেতে হবে।

সাগর সবার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, "যদি শাওন আপুর আব্বা দেখে ফেলে তখন কী হবে?"

রাজু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তখন অনেক বড় বিপদ হবে।"

শাওন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ, অনেক বড় বিপদ।"

"কাজেই এখন আমাদের কিছুতেই ধরা পড়া চলবে না—কিছুতেই না।"

"যদি কেউ আমাদের ধরতে চায় তা হলে সে রেলস্টেশনে আর বাসস্টেশনে অপেক্ষা করবে।"

"কেন?"

"কারণ তারা নিশ্চয়ই জানে আমরা ঢাকা যাব। আর ঢাকা যাবার উপায় কী, ট্রেন নাহয় বাস।"

"তা হলে তো মুশকিল হয়ে যাবে!"

রাজু মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, মুশকিল হয়ে যাবে। আমাদেরকে দেখলে হয়তো চিনবে না, কিন্তু শাওনকে তো চিনে ফেলবে।"

সবাই শাওনের দিকে তাকাল, সাগর মুখ ছুঁচালো করে বলল, "শাওন আপুর চেহারা এত সুন্দর, কেউ একবার দেখলেই ট্যারা হয়ে যাবে।"

রাজু চোখ পাকিয়ে সাগরের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। সাগর আবার বলল, "শাওন আপুকে ছদ্মবেশ করিয়ে নিলে কেমন হয়?"

"কী ছদ্মবেশ?"

"জুতা পালিশওয়ালা, না হলে কুলি, না হলে বাদামওয়ালা।"

সবাই আবার শাওনের দিকে তাকাল, সে জুতাপালিশ করছে কিংবা মাথায় করে সুটকেস টেনে নিচ্ছে কিংবা বাদাম বিক্রি করছে— ব্যাপারটা কেউ চিন্তাও করতে পারল না। রাজু আবার সাগরকে একটা ধমক দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আগুনালি বলল, "সাগর বুদ্ধিটা খারাপ দেয় নাই, যদি শাওন রাজুর শার্ট-প্যান্ট পরে চুলগুলি কেটে নেয়—"

সাগর মাথা নাড়ল, "নাহ! তবু শাওন আপাকে ছেলের মতন লাগবে না। কলম দিয়ে যদি মোচ এঁকে দেওয়া যায়—"

"ধুর গাধা! রাজু এবারে একটা ধমক লাগাল। আজকাল তো অনেক ছেলে মাথায় বেসবলের টুপি পরে। সেরকম একটা টুপি পরে নিলেই হয়।"

ছেলের ছদ্মবেশ পরার পর তাকে দেখতে কেমন লাগবে সেটা পরীক্ষা করে দেখা হল, কিন্তু শাওনের চেহারার মাঝে মেয়ের ভাবটা এত বেশি যে, যতই চেষ্টা করা যাক কিছুতেই তাকে ছেলের মতো দেখানো গেল না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে সবাই হাল ছেড়ে দিল।

শাওনকে যখন ছেলে সাজানো গেল না তখন তাকে বড় একজন মহিলা সাজানো যায় কি না সবাই সে-চিন্তা করতে লাগল। শাড়ি পরিয়ে যদি লম্বা একটা ঘোমটা দিয়ে দেওয়া যায় তা হলে কেউ তার চেহারা দেখতে পারবে না। বুদ্ধিটা খুব খারাপ না, কিন্তু একটা সমস্যা, আজগর মামার বাসায় কোনো শাড়ি নেই। মামি মারা গেছেন বহু আগে, বসার ঘরে মামির একটা ছবি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বাসায় কোথাও মামির কোনো একটা শাড়ি রয়ে যাবে তার কোনো আশা নেই জেনেও তারা একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখল। যখন কিছুই খুঁজে পেল না তখন আগুনালি বলল, "একটা শাড়ি কিনে আনলে কেমন হয়?"

"শাড়ি? কিনে আনলে?"

"হ্যাঁ। বাজারে কাপড়ের দোকানে কত শাড়ি! সস্তা একটা কিনে আনলেই হয়।"

"সস্তা?" সাগর চিৎকার করে বলল, "সস্তা কেন?"

আগুনালি থতমত খেয়ে বলল, "ঠিক আছে, দামিই নাহয় কিনে আনলাম।"

শাওন মাথা নাড়ল, বলল, "না না, শুধুশুধু একটা দামি শাড়ি কেন কিনে আনবে? আমি শাড়ি ভালো করে পরতেও পারি না। সস্তা কিনে আনলেই হবে।"

"কী রঙের শাড়ি কিনব?"

সাগর গলা উঁচিয়ে বলল, "লাল—লাল।"

রাজু মাথা নাড়ল, "না, লাল না। লাল শাড়ি সবার চোখে পড়বে। ম্যাটম্যাটে রঙের শাড়ি কিনতে হবে। নীল না হলে সবুজ। রাজু আগুনালির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি পারবে একটা শাড়ি কিনে আনতে?"

"না পারার কী আছে!"

দুপুরের ট্রেনটা ধরতে হলে এখনই একটা শাড়ি কিনে আনতে হবে, আগুনালি তাই তখন-তখনই রওনা দিল। বাজার থেকে শাড়ি কিনে রেস্টুরেন্টের ছেলেটাকে বলবে একটু বেশি করে খাবার পাঠাতে।

আগুনালি বের হবার পর রাজু আর সাগর তাদের ব্যাগ বের করে মাত্র সেখানে কাপড়-জামা রাখতে শুরু করেছে হঠাৎ দেখতে পেল কে যেন ছুটে ছুটে তাদের বাসার দিকে আসছে। রাজু আর সাগর অবাক হয়ে বাইরে গিয়ে দেখল আগুনালিই ছুটতে ছুটতে ফিরে আসছে। বারান্দায় উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "সর্বনাশ হয়েছে!"

রাজুর হঠাৎ ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। ঢোক গিলে বলল, "কী সর্বনাশ?"

"একটা মাইক্রোবাস থেমেছে। বাসভরতি অনেকগুলি মানুষ—"

মুহূর্তে শাওনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

আগুনালি বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, "মানুষগুলির হাতে বন্দুক।"

"বন্দুক?"

"হ্যাঁ। মানুষগুলি নেমে বাসাটাকে ঘিরে ফেলছে।"

"ঘিরে ফেলছে?"

"হ্যাঁ, তাকালে মনে হয় দেখতে পারবে। আগুনালি ভয়ার্ত চোখে চারিদিকে তাকাল এবং হঠাৎ চমকে উঠে বলল, "ঐ দেখো!"

রাজু শুকনো গলায় বলল, "সবাই ভিতরে চলো—তাড়াতাড়ি।"

সবাই ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। সাগর হঠাৎ কাঁদো-কাঁদো হয়ে যায়, খানিকক্ষণ কান্না আটকিয়ে রাখার চেষ্টা করে হঠাৎ কেঁদে উঠে বলল, "এখন কী হবে?"

শাওন এতক্ষণ ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, এবারে খুব ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে সোফায় বসে নিজের হাঁটুর উপর হাত রেখে শূন্যদৃষ্টিতে সবার দিকে তাকাল। তারপর প্রায় শোনা যায় না সেরকম গলায় বলল, "একটা ব্লেড আছে?"

রাজু চমকে উঠে শাওনের দিকে তাকাল। শাওন চোখ সরিয়ে নিয়ে খুব নরম গলায় বলল, "আমার বাবা খুব ভয়ংকর মানুষ। তোমরা চিন্তাও করতে পারবে না কত ভয়ংকর।"

কেউ কোনো কথা বলল না। শাওন চোখ তুলে বলল, "আমরা ধরা পড়ে গেছি। এখন আর কিছু করার নেই। আমাকে এখন বাইরে যেতে হবে। আমাকে পেলে তোমাদের হয়তো কিছু বলবে না।"

তখনও কেউ কোনো কথা বলল না। শাওন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোমরা খুঁজে আমাকে একটা ব্লেড এনে দাও। প্লীজ দেরি কোরো না।"

রাজু আগুনালির দিকে তাকাকেই সে মাথা নিচু করে ফেলল। সাগর এতক্ষণ নিজের কান্না আটকে রেখেছিল, এবারে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রাজু জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, যে-মানুষগুলি আস্তে আস্তে বাসাটাকে ঘিরে ফেলছে তারা আরও এগিয়ে এসেছে, তাদের চেহারা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মানুষগুলির চেহারা কী ভয়ংকর—মুখে কোনোরকম অনুভূতির চিহ্ন নেই! হাতে নিশ্চয়ই কোনোরকম অস্ত্র ধরে রেখেছে, কিন্তু চাদরে শরীর ঢাকা, তাই অস্ত্রটা দেখা যাচ্ছে না। রাজু মানুষগুলিকে দেখে একবার শিউরে উঠল, কী ভয়ংকর ভাবলেশহীন চেহারা!

শাওন সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দেরি করে লাভ নেই রাজু। তোমার মামার শেভ করার ব্লেড নিশ্চয়ই আছে, খুঁজে দেখো। আমি লুকিয়ে রাখব—নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।"

রাজু শেষবারের মতো ব্যাপারটা চিন্তা করার চেষ্টা করে। সত্যিই কি তাদের কিছু করার নেই? কোনোভাবেই কি আর শাওনকে বাঁচাতে পারবে না? হঠাৎ করে তার মুখে একটা যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে ওঠে। এতদূর আসার পর তাদের হেরে যেতে হবে? একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে না?

রাজু হঠাৎ শাওনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "শাওন—"

শাওন রাজুর গলার স্বর শুনে চমকে উঠে বলল, "কী হয়েছে রাজু?"

"তুমি বলছ তুমি তো মরেই যাবে।"

"হ্যাঁ।"

"যে মরে যাবে তার তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তুমি কি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাও?"

শাওন অবাক হয়ে বলল, "কী চেষ্টা?"

"আমার মামার একটা মোটর-সাইকেল আছে। তুমি মোটর-সাইকেলে আমার পিছনে বসবে। লোকগুলি যখন খুব কাছে আসবে, হঠাৎ দরজা খুলে মোটর-সাইকেলে করে আমরা বের হয়ে যাব।"

শাওন এমনভাবে রাজুর দিকে তাকাল যেন সে ঠিক বুঝতে পারছে না রাজু কী বলছে। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রাজুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি মোটর-সাইকেল চালাতে পার?"

"একটু একটু পারি।"

"তুমি সত্যি সত্যি পারবে?"

রাজু সত্যি সত্যি পারবে কি না জানে না, কিন্তু সে মুখ শক্ত করে বলল, "একশোবার পারব।"

শাওন একবার আগুনালির দিকে তাকাল, আগুনালি মাথা নেড়ে বলল, "ফার্স্ট ক্লাস বুদ্ধি!"

সাগর হঠাৎ চোখ মুছে উজ্জ্বল চোখে বলল, "হ্যাঁ ভাইয়া, হ্যাঁ। মামার বন্দুকটা বের করব?"

রাজু চমকে উঠল, সাগর সত্যি কথাই বলেছে, মামার একটা বন্দুক রয়েছে। আলমারিতে তালা মারা, কিন্তু কাচ ভেঙে ভিতর থেকে বের করে নেওয়া যেতে পারে। রাজু আগুনালির দিকে তাকিয়ে বলল, "আগুনালি, দেখো তো বন্দুকটা বের করতে পার কি না—পারলে নিয়ে আসো।" তারপর শাওনের দিকে তাকিয়ে বলল, "চলো শাওন আমার সাথে।"

মোটর-সাইকেলের চাবিটা বের করে সে শাওনের হাত ধরে তাকে নিয়ে ছুটে চলল।

যে-ঘরটাতে মোটর-সাইকেলটা রাখা সেটা এক কোনায়। সামনের দরজাটা ছিটকিনি নিয়ে লাগানো ছিল, রাজু সাবধানে সেটা খুলে নিল। এখন মোটর-সাইকেল নিয়ে ছুটে এসে দরজায় ধাক্কা দিলেই সেটা ছিটকে খুলে যাবার কথা। রাজু মোটর-সাইকেলে বসে চাবি ঢোকাল। শাওন আগে কখনও মোটর-সাইকেলে চড়েছে বলে মনে হল না, সেখানে কেমন করে বসতে হয় সেটা দেখিয়ে দিতে হল। রাজু গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "আমাকে খুব শক্ত করে ধরো রেখো।"

শাওন মাথা নেড়ে বলল, "রাখব।"

রাজু স্টার্টারে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আগুনালি বন্দুকটা বের করতে পেরেছে কি না কে জানে, যদি না পারে তা হলে এমনিতেই যেতে হবে। আর দেরি করা যাবে না। রাজু নিশ্বাস বন্ধ করে মোটর-সাইকেলে বসে থেকে যখন প্রায় স্টার্ট দিয়ে দিচ্ছিল তখন সে হঠাৎ দেখতে পেল আগুনালি আর সাগর ছুটে আসছে, আগুনালির হাতে মামার বন্দুকটা। কাছে এসে বলল, "কী করব এটা?"

রাজু বলল, "আমাদের কাছে দাও। বন্দুক দেখে যদি ভয় পায়—"

"কেমন করে নেবে?"

"শাওনের পিঠে ঝুলিয়ে দাও।"

আগুনালি এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সেটা শাওনের পিঠে ঝুলিয়ে দিল। রাজু গলা নামিয়ে বলল, "আমরা যখন বের হব তখন সবাই আমাদের পিছুপিছু ছুটবে। সেই ফাঁকে তুমি সাগরকে নিয়ে বের হয়ে যেয়ো। বাসায় ভিতরে থেকো না, টিলার দিকে চলে যেয়ো।"

"যাব।"

"আর আমি চেষ্টা করব ঢাকার দিকে যেতে। রাস্তাটা কোনদিকে তুমি জান?"

"জানি। খুব সোজা রাস্তা। এই বাসার রাস্তা দিয়ে দুই কিলোমিটার গেলে বাজার। তখন ডান দিকের বড় রাস্তায় উঠে যাবে। সেটা ধরে সোজা পশ্চিমদিকে।"

"পশ্চিম কোনদিক? আমি পূর্ব-পশ্চিম চিনি না।"

"ডানদিকে। সোজা ডানদিকে।"

"ঠিক আছে। আমরা তা হলে গেলাম।" রাজু আগুনালির চোখের দিকে তাকাল, তারপর নরম গলায় বলল, "দোয়া কোরো।"

"করব।"

রাজু এবারে সাগরের দিকে তাকাল, তার দিকে চোখ মটকে বলল, "সাবধানে থাকিস।"

সাগর খুব সাবধানে চোখ মুছে মাথা নাড়ল। সে সত্যিই সাবধানে থাকবে।

রাজু তার স্পর্টারে লাথি দিতেই মোটর-সাইকেলটা গর্জন করে উঠল, সাথে সাথে সে অনুভব করল শাওন তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে, ঘাড়ের কাছে তার মুখটা রেখেছে, প্রায় তার গাল স্পর্শ করে আছে তার মুখ, মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে, সব মানুষের শরীরে বুঝি একধরনের গন্ধ থাকে।

রাজু বাম হাতে ক্লাচটা শক্ত করে ধরে এক্সেলেটর ঘোরাল, মোটর-সাইকেলটা হঠাৎ হিংস্র একটা জানোয়ারের মতো দাপিয়ে ওঠে, সে ক্লাচ ছেড়ে দিতেই সেটা প্রায় লাফিয়ে উঠে একটা ঝটকা দিয়ে সামনে ছুটে গেল, প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল দরজাকে। বিকট শব্দে দরজার পাল্লাগুলি ছিটকে খুলে যায় আর তার মাঝে দিয়ে রাজু গুলির মতো বের হয়ে আসে।

বাসার সামনে খানিকটা জায়গা অসমতল, সেখানের মোটর-সাইকেলটা একবার লাফিয়ে উঠে প্রায় কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, পা দিয়ে সে কোনোমতে সামলে নিল। ঠিক তার সামনে দুইজন মানুষ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মুখে অবিশ্বাসের চিহ্ন। রাজু মোটর-সাইকেলটা সোজা তাদের দিকে ছুটিয়ে নেয়, মানুষগুলি লাফিয়ে দুই পাশে সরে গেল। রাজু এক্সেলেটর ঘোরাতেই মোটর-সাইকেলটা আবার গর্জন করে উঠে প্রায় লাফিয়ে উঠল এবং সবার চোখের সামনে দিয়ে সেটা তীব্র গতিতে বের হয়ে গেল।

শাওন মাথা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল, ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। কিছু মানুষ ছোটাছুটি করছে, কিন্তু তাদেরকে আর ধরতে পারবে না। রাজু পা দিয়ে গিয়ার পালটে নেয় দ্রুত, দেখতে দেখতে মোটর-সাইকেলের বেগ আরও বেড়ে যায়। খোয়া-ছড়ানো রাস্তায় সেটা ধুলো উড়িয়ে ছুটে যেতে থাকে। রাজুকে শক্ত করে ধরে রেখে শাওন আবার পিছন দিকে তাকাল, দূরে আজগর মামার বাসা—বাসার সামনে মাইক্রোবাসটা দাঁড়িয়ে আছে। বাসটাকে ঘিরে কিছু মানুষজন, কিন্তু তারা বাসটাতে উঠছে না, ছোটাছুটি করছে। কেন মানুষগুলি মাইক্রোবাসে উঠছে না বোঝা গেল হঠাৎ, বিশাল একটা আগুনের হলকা ভিতর থেকে বের হয়ে এল। আগুনালি নিশ্চয়ই তার তৈরি একটা বোমা ভিতরে ছুড়ে দিয়েছে।

রাজু রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, দুই কিলোমিটার সামনে একটা বাজার, বাজারে গিয়ে ডানদিকে গিয়ে বড় রাস্তায় উঠতে হবে। শাওন রাজুর কানের কাছে মুখ এনে বলল, "আগুনালি মাইক্রোবাসে বোমা মেরেছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, আগুন জ্বলছে বাসে।"

"তাকে ধরতে পারেনি তো?"

"বোঝা যাচ্ছে না।"

রাজু একটা নিশ্বাস ফেলে ব্যাপারটা মাথা থেকে বের করে দেয়। এখন তার আর কিছু করার নেই। শাওনকে নিয়ে ঢাকার দিকে ছুটে যাওয়া ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই।

বাজারের কাছে এসে সে মোটর-সাইকেলের গতি কমিয়ে আনল, রাস্তার পাশে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। একটা বাচ্চা ছেলে বিশাল একটা মোটর-সাইকেল ছুটিয়ে নিচ্ছে আর তার পিছনে বসে আছে একটা ফুটফুটে মেয়ে। বাতাসে মেয়েটার চুল উড়ছে আর সে শক্ত করে ধরে রেখেছে ছেলেটাকে। মেয়েটার পিঠে ঝুলছে একটা বন্দুক। অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য—তারা সত্যিই দেখছে কি না কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। ব্যাপারটা কী বোঝার আগেই মোটর-সাইকেলটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তাদের সামনে থেকে।

রাজু ডানদিকে ঘুরে রাস্তায় উঠে গিয়ে আবার মোটর-সাইকেলের বেগ বাড়িয়ে দিল। রাস্তাটা অনেক ভালো, তার মনে হল সে বুঝি মোটর-সাইকেলকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু সত্যি আর উড়িয়ে নেওয়ার দরকার নেই, আগুনালি যদি মাইক্রোবাসটাকে পুড়িয়ে দিতে পেরে থাকে তাদের বিপদ মনে হয় কেটে গেছে। এখন তাদের শুধু সরে যেতে হবে। যত দূরে সম্ভব সরে যেতে হবে।

বড় রাস্তায় উঠে প্রথম কিছুক্ষণ রাজু আর শাওনের সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে ছিল। খুব ধীরে ধীরে তারা খানিকটা সহজ হল। মোটর-সাইকেলটা মোটামুটি ভালভাবে যাচ্ছে, রাস্তার দুপাশের গাছপালা হুশ হুশ করে বের হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ করে বিকট একটা ট্রাক সামনের দিক থেকে ছুটে আসে, তখন কিছুক্ষণের জন্যে রাজুর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তবে বড় রাস্তায় ট্রাক বাস গাড়ির মাঝখানে সে আগেও সাইকেল চালিয়েছে, কাজেই মাথা ঠাণ্ডা রেখে সে রাস্তার এক পাশে চলে এসে ট্রাকগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। তবে ওদের সমস্যা হল সম্পূর্ণ অন্যদিক দিয়ে যেসব গাড়ি ট্রাক বাস তাদের পিছন থেকে আসছে তারা তাদের দেখে ব্যাপারটা কী হচ্ছে বোঝার জন্যে তাদের পাশে পাশে যাবার চেষ্টা করে। কৌতূহলী মুখ জানালা দিয়ে মাথা বের করে, কিছু একটা জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করে। তখন হয় রাজুকে এক্সেলেটর ঘুরিয়ে সামনে চলে যেতে হয়, নাহয় ব্রেক করে পিছিয়ে আসতে হয়। তবু তারা মানুষের কৌতূহল থেকে উদ্ধার পাবে বলে মনে হয় না। রাস্তায় খবর ছড়িয়ে পড়েছে, পুলিশের কানে যখন যাবে তখন তারাও কি চলে আসবে না? মানুষের যখন বিপদ তখন তো পুলিশের কাছেই যাবার কথা, কিন্তু এই ব্যাপারটায় পুলিশ কি তাদের পক্ষে, নাকি শাওনের বাবার পক্ষে?

রাজু যত ভালো করে মোটর-সাইকেল চালাবে ভেবেছিল তার থেকে অনেক ভালো করে চালাচ্ছে। প্রথম প্রথম যেটুকু ভয় ছিল এখন তার একবিন্দুও নেই। যত সময় যাচ্ছে উলটো তার সাহস বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ যদি পিছন থেকে ধরতেও আসে সে এত জোরে চালিয়ে যেতে পারবে যে কেউ তাকে ধরতেও পারবে না। মনে হচ্ছে যদি সামনে একটা খানাখন্দ চলে আসে সে উড়ে বের হয়ে যেতে পারবে।

মোটর-সাইকেলে যেতে যেতে রাজু আর শাওন টুকরো টুকরো কথা বলতে শুরু করে, বাতাসের শব্দ, মোটর-সাইকেলের গর্জন সব মিলিয়ে কথা শোনা যায় না, তাই

চিৎকার করে করে কথা বলতে হচ্ছিল। জরুরি কথা চিৎকার করে বলা যায়, কিন্তু সাধারণ কথা চিৎকার করে বলা সহজ নয়। তবু তারা চেষ্টা করে যেতে থাকে—কে কোন ক্লাসে পড়ে, কোন স্কুলে যায়, রোল নম্বর কত, সবচেয়ে খারাপ লাগে কোন সাবজেক্ট পড়তে, সরল অঙ্ক এত কঠিন, কিন্তু সরল নাম কেন দেওয়া হল—তারা এই ধরনের কথাবার্তা চালিয়ে যায়। রাস্তার দুপাশের দৃশ্য পালটে যেতে থাকে। প্রথমে ঘরবাড়ি দোকানপাট ছিল, ধীরে ধীরে সেগুলি পালটে গিয়ে গ্রামের দৃশ্য এসে যায়। রাস্তার দুধারে বিস্তীর্ণ সোনালি ধানক্ষেত, বিল, নদী, গাছপালা, ঝোপঝাড়, গোরু নিয়ে যাচ্ছে রাখাল ছেলে। এরকম পরিবেশে এলে মন ভালো হয়ে যাবার কথা। কিন্তু রাজুর মন ভালো হয়ে যাচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে একটা চাপা ভয়—সবকিছু মিলিয়ে একধরনের অশান্তি। সাগরকে একা একা ছেড়ে এসেছে, আগুনালি আবার মাইক্রোবাসের ভিতর একটা বোমা ছেড়ে বসেছে, সেটা করতে গিয়ে তার আর কোনো বিপদ হল কি না, ধরা পড়ে গেল কি না? যদি ধরা পড়ে গিয়েই থাকে তা হলে কী অবস্থায় আছে, সাগরই-বা কী অবস্থায় আছে—সব মিলিয়ে ভিতরে চাপা দুশ্চিন্তায় একটুও শান্তি পাচ্ছে না। শুধু তাই না, শাওনের বাবার লোকজন তাদেরকে চলে যেতে দেখেছে, আগে হোক পরে হোক তাদের পিছুপিছু ছুটে আসবে। যখন ধরে ফেলবে তখন কী হবে? রাজু জোর করে মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিল। যা হবার হবে—সে যেটা করেছে সেটা যদি না করত তা হলেও শাওনের সর্বনাশ হয়ে যেত। জেনেশুনে সে শাওনকে তো মারা যেতে দিতে পারে না—কিছুতেই না।

রাজু ঘণ্টাখানেক একটানা মোটর-সাইকেল চালিয়ে রাস্তার পাশে মোটর-সাইকেলটা থামাল। গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে, একটু হাত-পা ছড়িয়ে হেঁটে শরীরটাকে ঠিক করে নেওয়া দরকার। ব্যাপারটা অবিশ্যি খুব সহজ হল না, দেখতে দেখতে তাদেরকে ঘিরে ছোট বাচ্চাদের একটা ভিড় জমে উঠল। শুধু তাই না, যেসব গাড়িকে তারা পার হয়ে এসেছিল তাদেরকে থামতে দেখে এইসব গাড়িও থেমে গেল। গাড়ি থেকে লোকজন নেমে এল কথা বলার জন্যে। রাজু ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে আবার মোটর-সাইকেলে চেপে বসে, তার পিছনে শাওন। লোকজন তাদেরকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে, কিন্তু রাজু না শোনার ভান করে মোটর-সাইকেল স্টার্ট দিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল। ব্যাপারটা ভালো হল না খারাপ হল সে জানে না, কিন্তু তাদের আর কিছু করার নেই।

আরও ঘণ্টাখানেক যাবার পর রাজু আর শাওন মোটামুটি একই সাথে দুটি জিনিস টের পেল, তাদের খুব খিদে পেয়েছে এবং একটু বাথরুমে যাওয়া দরকার। ছেলেদের বাথরুমে যাওয়া খুব সোজা, একটা গাছের আড়ালে চলে গেলেই হল, কিন্তু একটা মেয়ের জন্য সত্যিকারের একটা বাথরুম খুঁজে বের করতে হবে।

খাওয়া এবং বাথরুমের জন্যে কোথাও হয়তো থামতেই হবে, সাথে বন্দুকটা না থাকলে ব্যাপারটা সোজা হত, কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। কিছু-একটা বানিয়ে বলতে হবে, কারও জন্যে নিয়ে যাচ্ছে বা এই ধরনের কিছু। রাস্তার পাশে বাড়িঘর দেখে যখন রাজু থামবে-থামবে করছিল তখন হঠাৎ শাওনের ভয়-পাওয়া গলা শুনতে পেল, "রাজু!"

"কী হয়েছে?"

"পিছনে একটা মাইক্রোবাস!"

"কার মাইক্রোবাস?"

"দেখে একটু অন্যরকম লাগছে, কিন্তু মনে হচ্ছে আমার বাবার।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, আগুনে পুড়ে ময়লা হয়েছে বলে অন্যরকম লাগছে।"

"ভিতরে কয়জন?"

"বোঝা যাচ্ছে না।"

রাজু তার মোটর-সাইকেলের স্পীড বাড়িয়ে দিল, মাইক্রোবাসটা দেখতে দেখতে অনেক পিছনে পড়ে গেল, কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝে সেটা আবার তাদের ধরে ফেলল। সামনে রাস্তাটা খারাপ, রাজুকে তার স্পীড কমিয়ে আনতে হল, আর তখন মাইক্রোবাসটা একেবারে কাছে চলে এল। শাওন পিছনে তাকিয়ে শিউরে ওঠে—ড্রাইভারের পাশে বসে থেকে তার বাবা স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। শাওন কাঁপা গলায় বলল, "মাইক্রোবাসে আমার বাবা বসে আছে—"

রাজু তার ভিতরে একটা কাঁপুনি অনুভব করে, কিন্তু অনেক কষ্ট করে সে নিজেকে শান্ত করে রাখল। আজগর মামার নির্জন বাসায় একদল মানুষ হামলা করে শাওনকে ধরে নিয়ে যাওয়া একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু পরিষ্কার দিনের বেলা রাস্তার উপর থেকে শাওনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে অন্য ব্যাপার। রাজু চিৎকার করে বলল, "শাওন, বন্দুকটা হাতে নাও।"

শাওন গত দুই ঘন্টা মোটর-সাইকেলের পিছনে বসে বসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, রাজুকে ধরে না রেখেই সে এখন বসে থাকতে পারে। দুই হাত ব্যবহার করে সে বন্দুকটা হাতে তুলে নিল।

রাজু আবার চিৎকার করে বলল, "মাইক্রোবাসটার দিকে বন্দুকটা ধরে রাখে, কিন্তু খবরদার গুলি কোরো না—"

"যদি আমাদের গুলি করে?"

"আমাদের করতে চাইলে এর মাঝে করতে পারত—বন্দুক দিয়ে গুলি করতে ধাক্কা লাগে, উলটে পড়ে যাবে।"

"ঠিক আছে।"

রাজুর কথা শেষ হবার আগেই মাইক্রোবাসটা রাজুকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে যাবার চেষ্টা করল, রাজু এক্সেলেটর ঘুরিয়ে স্পীড বাড়িয়ে ফেলল, সে সামনে যেতে দিতে চায় না।

মোটর-সাইকেলের স্পীড বেড়ে গেছে খুব বেশি, থরথর করে কাঁপছে। রাস্তা ভালো নয়—যে-কোনো সময় একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। রাজু দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত করে ধরে রাখে, বাতাসের ঝাপটায় চোখ খোলা রাখতে পারছে না। ঠিক তখন শিস দেবার মতো একটা শব্দ শুনতে পেল, সাথে সাথে শাওন চিলের মতো গলায় চিৎকার করে উঠল, "গুলি করছে আমাদের!"

রাজুর মেরুদণ্ড দিয়ে আবার একটা ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে যায়। মনে হয় সবকিছু চিন্তা করার ক্ষমতা শেষ হয়ে যাচ্ছে, সবকিছু কেমন যেন ধোঁয়াটে আর অস্পষ্ট মনে হচ্ছে। জোর করে সে মাথা ঠিক রাখল, তাকে এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতেই হবে। কী হবে সে জানে না, কিন্তু কোনো ভুল যেন না হয়। তারা মাত্র দুজন, কিন্তু শাওনের বাবার দলে অনেক মানুষ। তাদের দিকে এখন দরকার আরও মানুষের, রাস্তার মানুষ, বাজারের মানুষ—গ্রামের মানুষ—

সামনে কিছু দোকানপাট দেখা যাচ্ছে, সেই পর্যন্ত কি সে পৌঁছাতে পারবে? রাজু আবার এক্সেলেটর ঘুরিয়ে দেয়, ঠিক তখন দ্বিতীয় গুলিটার শব্দ শুনতে পেল। মোটর-সাইকেলের টায়ারে গুলি লেগেছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, তার মাঝে অনেক

কষ্ট করে তাল সামলাল রাজু, ব্রেক করল প্রাণপণে, পেছন থেকে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল শাওন। মোটর-সাইকেলটা বিপজ্জনকভাবে একবার রাস্তার বামদিক থেকে ডানদিকে গিয়ে রাস্তার মাঝামাঝি হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মোটর-সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ল রাজু আর শাওন। প্রচণ্ড জোরে আঘাত লেগেছে মাথায়, মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সে, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সে নিজেকে জ্ঞান হারাতে দিল না। চোখ খুলে তাকাল রাজু, শাওন উঠে দাঁড়িয়েছে তার আগে, তার চোখেমুখে একরকম অবিশ্বাসের দৃষ্টি। চারিদিকে ঘুরে তাকাল একবার, তারপর রাজুর কাছে ছুটে এল, ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "রাজু, কেমন আছ তুমি?"

রাজু ফিসফিস করে বলল, "ঠিক আছি।"

সে কোনোমতে উঠে বসার চেষ্টা করল, রাস্তার মাঝখানে মোটর-সাইকেলটা উলটো হয়ে পড়ে আছে, পিছনের টায়ারটা ফেটে গেছে, তার মাঝেই সেই চাকাটা ঘুরে যাচ্ছে—কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে সেজন্যে! রাজু সামনে তাকাল, মাইক্রোবাসটা থেমেছে সামনে আর দরজা খুলে নেমে এসেছে শাওনের বাবা। তার পিছুপিছু আরও অনেকগুলি লোক। মানুষগুলি ছুটে আসছে তাদের দিকে, একবার ধরে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে। রাজু উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু উঠতে পারল না, কোথায় জানি বেকায়দা ব্যথা লেগেছে, কিছু একটা ভেঙে গেছে কোথাও।

শাওন শূন্যদৃষ্টিতে একবার সামনে তাকাল, তারপর রাজুর দিকে তাকাল। রাজু ফিসফিস করে বলল, "বন্দুক।"

শাওন হঠাৎ যেন জ্ঞান ফিরে পেল, বন্দুকটা পড়ে আছে একটু দূরে, হাত থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। তাদের ভাগ্য ভালো গুলি বের হয়নি। শাওন বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে রাজুর কাছে ছুটে আসে, রাজু তখন কোনোমতে উঠে বসেছে হাঁটুতে ভর দিয়ে। রাজু আবার ফিসফিস করে বলল, "বন্দুকটা ওদের দিকে ধরো—আমার ঘাড়ে রেখে এইম করো।"

শাওন রাজুর পিছনে বসে পড়ে বন্দুকটা তার বাবার বুকের দিকে তাক করে রাখল।

শাওনের বাবা লম্বা পায়ে হেঁটে আসছিল, হঠাৎ করে বন্দুকটা দেখে থেমে গেল। শাওন চিৎকার করে বলল, "আর এক পা এলে গুলি করে দেব।"

শাওনের বাবা থেমে গেল, তার ফরসা মুখ আস্তে আস্তে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত ঘসে বলল, "বেতমিজ মেয়ে—"

শাওন চিৎকার করে বলল, "চুপ করো তুমি—চুপ করো!"

রাজু কোনোদিকে না তাকিয়েই বুঝতে পারে তাদের ঘিরে ভিড় জমে উঠছে। রাস্তায় গাড়ি থেমে যাচ্ছে, গাড়ি থেকে প্যাসেঞ্জার নেমে আসছে। ট্রাক থেকে ট্রাক-ড্রাইভাররা নেমে আসছে। দোকানপাট থেকে মানুষ ছুটে আসছে। ঠিক রাস্তার মাঝখানে একটা বাচ্চা মেয়ে তার বয়সী একটা ছেলের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সন্ত্রাস্ত চেহারার একজন মানুষের দিকে তাক করে রেখেছে—দৃশ্যটি অকল্পনীয়। কেউ যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

শাওনের বাবা হুঙ্কার দিয়ে বলল, "ফারজানা—"

"আমি ফারজানা না। আমার নাম শাওন।"

শাওনের বাবার মুখ অসহ্য ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেল, অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে রাখল। তাদেরকে ঘিরে যেসব মানুষ দাড়িয়ে ছিল তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

শাওনের বাবা শান্ত গলায় বলল, "আমার মেয়ে। বদ ছেলের পাল্লায় পড়ে কী করেছে দেখেন। দেশে আইন নেই? এই বয়সী ছেলের হাতে বন্দুক? মোটর-সাইকেল?"

মানুষজনের মাঝে একটা গুঞ্জন শোনা যায়, আজকালকার ছেলেরা যে অসম্ভব পাজি হঠাৎ করে সে-বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকে না। শাওনের বাবা গলা উঁচিয়ে বলল, "আপনারা যারা আছেন তারা মেয়েটার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নেন দেখি—"

এরকম সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন মানুষের কথা শুনে কয়েকজন সত্যি সত্যি পিছন দিক থেকে এগিয়ে আসছিল, তখন হঠাৎ শাওন চিলের মতো চিৎকার করে উঠল, "খবরদার! ঐ মানুষটা আসলে জানোয়ার। সে রাজাকার। তার বাবা রাজাকার—আমাকে মায়ের কাছে থেকে ধরে এনেছে—খবরদার কেউ কাছে আসবে না।"

যারা কাছে এগিয়ে আসছিল তার হঠাৎ থেমে গেল। শাওনের মতো ফুটফুটে চেহারার একটা মেয়ে নিশ্চয়ই মিথ্যা বলছে না। শাওন আবার চিৎকার করে বলল, "আমাকে বেঁধে রেখেছিল—আমি পালিয়ে এসেছি। মায়ের কাছে যাচ্ছি—এরা এসেছে আমাকে ধরে নিতে।"

কমবয়সী একজন মানুষ হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে শাওনের বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কি সত্যি?"

শাওনের বাবা কিছু বলার আগেই শাওন বলল, "সত্যি। আমার কথা বিশ্বাস না করলে আমার মাকে জিজ্ঞস করেন। পুলিশ ডেকে আনেন—ঐ লোকটার কথা বিশ্বাস করবেন না। সে জানোয়ার। রাজাকার—"

একটি বাচ্চা মেয়ে যদি পুলিশকে ডেকে আনতে বলে নিজের মাকে ডেকে আনতে বলে, সে নিশ্চয়ই বদ ছেলের পাল্লায় পড়া বখে-যাওয়া মেয়ে হতে পারে না। উপস্থিত লোকজন হঠাৎ করে শাওনদের পক্ষে চলে আসে। শাওন আবার চিৎকার করে বলল, "আমাদের ধরে নেয়ার জন্যে দেখেন সে আমাদের গুলি করেছে—"

রাজু ভীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শাওনের বাবার দিকে তাকিয়ে ছিল। মানুষটির মুখে পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। বুঝতে পেরেছে সবাই শাওনের কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তার মুখে প্রথমে ক্রোধ, তারপর ঘৃণা এবং সবার শেষে একধরনের বিচিত্র জিঘাংসার চিহ্ন ফুটে উঠল। রাজু মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ এক ধরনের অশুভ আতঙ্ক অনুভব করে। হঠাৎ করে মানুষটি সত্যি সত্যি দানবে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তার চোখে মুখে চেহারায় একটা হিংস্র পশু বের হয়ে আসে। মানুষটি হঠাৎ শার্টের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলবার বের করে আনে, তারপর কেউ কিছু বোঝার আগে লম্বা পা ফেলে এসে শাওনের মাথার দিকে তাক করে ধরল। রাজু মানুষটার মুখের দিকে তাকাল, আর হঠাৎ করে বুঝতে পারল সে ভয় দেখানোর জন্যে শাওনের মাথায় রিভলবারটি ধরেনি, গুলি করার জন্যে ধরেছে। শাওনকে মানুষটি মেরে ফেলবে। আর একটিমাত্র মুহূর্ত, তারপর শাওন আর্তনাদ করে পিছনে পড়ে যাবে, কেউ আর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কেউ পারবে না। আর একটিমাত্র মুহূর্ত। মাত্র একটি মুহূর্ত।

সেই একটি মুহূর্ত যেন হঠাৎ বিশাল মহাকালের মতো বিস্তৃত হয়ে গেল। রাজু দেখতে পেল ট্রিগারে আঙুল চেপে বসেছে, দেখতে পেল রিভলবারের সকেট ঘুরতে শুরু করেছে, দেখতে পেল রিভলবারের হ্যামার পিছন দিকে সরে যাচ্ছে, দেখতে পেল মানুষটির মুখে কুশ্রী একটা আত্মতৃপ্তির হাসি লেপটে যাচ্ছে, আর সেইসব কিছু দেখতে দেখতে হঠাৎ রাজুর সমস্ত যন্ত্রণা যেন উবে গেল ম্যাজিকের মতো। হঠাৎ করে তার শরীরে

যেন চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা এসে ভর করল। তার সমস্ত শরীর হঠাৎ ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে উঠল, তারপর ক্রুদ্ধ গোখরো যেমন করে ছোবল দেয় ঠিক সেইরকম আক্রোশ নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবটির দিকে। সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করল মানুষটির রিভলবার-ধরা হাতটিকে।

প্রচণ্ড একটা শব্দ শুনতে পেল রাজু, সাথে সাথে ভয়ংকর একটা আঘাতে ছিটকে পড়ল নিচে। গুলি লেগেছে তার শরীরে। কোথায় লেগেছে গুলি? ব্যাথা করছে না কেন তার? রাজু চোখ খুলে তাকাল, রাস্তায় শুয়ে আছে সে, উপরে আকাশ। কী সুন্দর নীল আকাশ! আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টের পেল তার শরীর ভিজে যাচ্ছে উষ্ণ রক্তে। উপুড় করে রাখা বোতলের মতো গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। রাজু তার হাতটা রাখল বুকে, হাত ভিজে গেল রক্তে। সে চোখের সামনে এনে ধরল তার হাত, টকটকে লাল হয়ে আছে তার হাত। রক্ত এত লাল হয়? কী আশ্চর্য!

রাজু হাত নামিয়ে এনে চোখ বন্ধ করল। ভয় নয়, আতঙ্ক নয়, কষ্ট বা যন্ত্রণা নয়, ক্লান্তি লাগছে তার। কী অমানুষিক ক্লান্তি—সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে সেই ক্লান্তিতে। কেউ যেন তাকে ডাকছে বহুদূর থেকে। খুব চেষ্টা করে চোখ খুলল রাজু। তার উপর ঝুঁকে আছে শাওন। চিৎকার করে ডাকছে তার নাম ধরে। রাজু মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে শাওনের দিকে, কী সুন্দর দেখতে মেয়েটি! আহা, কী সুন্দর! সে কি তাকিয়ে থাকতে পারবে শাওনের দিকে? নাকি আবার তার চোখ বন্ধ হয়ে আসবে?

রাজু শাওনের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখল সে ডাকছে তার নাম ধরে, "রাজু—রাজু—রাজু—"

রাজুর ইচ্ছে করল বলতে, এই তো আমি—কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না। সে শাওনের দিকে তাকিয়ে রইল, দেখল সে এখনও চিৎকার করে ডাকছে, কিন্তু তার কথা আর শোনা যাচ্ছে না। শুধু তাকে দেখছে, কিন্তু কিছু আর শুনতে পারছে না। মানুষজনের চিৎকার হৈচৈ কোলাহল কিছু নেই। কোথাও আর কোনো শব্দ নেই। চারদিকে শুধু আশ্চর্য সুমসাম নীরবতা।

এটাকেই নিশ্চয়ই মৃত্যু বলে—এমন কিছু তো খারাপ নয়।

শাওন অবাক হয়ে দেখল রাজুর মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠেছে।

৭. পরিশিষ্ট ঃ দুই সপ্তাহ পর

টেবিলের উপর একটা ফুলদানি, সেটা ভরে উপচে রয়েছে ফুলে। ঘরের ভিতরে সাধারণত ফুল থাকে না, ফুল থাকবে বাগানে, তবুও কীভাবে কীভাবে জানি একটা মৌমাছি খবর পেয়ে চলে এসেছে ভিতরে। একটা একটা করে ফুল পরীক্ষা করে দেখছে মৌমাছিটা, মনে হচ্ছে খুব খুঁতখুঁতে স্বভাবের—কোনো ফুলই পছন্দ হচ্ছে না, আবার চলেও যাচ্ছে না বিরক্ত হয়ে।

রাজু বিছানায় আধশোয়া হয়ে মৌমাছিটাকে দেখছে মুগ্ধ হয়ে। পৃথিবীতে কত ছোট ছোট জিনিসই-না আছে যেগুলি সে কোনোদিন চোখ খুলে দেখেনি, অথচ আর একটু হলে তার কিছুই আর দেখা হত না। গুলিটা যদি আর এক সেন্টিমিটার উপর দিয়ে যেত তার হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে যেত। ফুসফুসে গুলি লেগে সেটা বুজে গিয়েছিল, বেঁচে যে গিয়েছে

সেটা নাকি একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বড় বিপদটা কেটে গিয়েছে, এখন শুধু ধীরে ধীরে সুস্থ হওয়া। ডাক্তার বলেছে কম করে হলেও তিন মাস সময় লাগবে। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু কিছু করার নেই। রাজু একটা নিশ্বাস ফেলে একটু সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল সাথে সাথে বুকের ভিতরে টনটন করে ওঠে যন্ত্রণায়। রাজু দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা সহ্য করে, বেঁচে থাকা বড় মধুর ব্যাপার—তার জন্যে যেটুকু কষ্ট করা দরকার সে করবে।

দরজায় টুকটুক করে একটা শব্দ হল। আম্মা উঠে গেলেন দেখতে। দরজাটা একটু ফাঁক করতেই প্রথমে শাওন এবং শাওনের পিছুপিছু তার মা এসে ঢুকলেন। শাওন কেমন করে এত সুন্দর হল সেটা তার মাকে দেখলে খানিকটা বোঝা যায়—দেখতে ঠিক শাওনের মতো সুন্দরী, দেখে বোঝাই যায় না শাওনের মা, মনে হয় বুঝি বড় বোন। শাওন আম্মার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "রাজু কেমন আছে খালাম্মা?"

"ভালো মা, অনেক ভালো। কালকে একটু হেঁটেছে।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"ওর সাথে কথা বলা যাবে?"

"হ্যাঁ মা, কথা বলা যাবে। ডাক্তার বলেছে এখন শুধু সুস্থ হওয়া বাকি। যত মন ভালো থাকবে তত তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে। শুধু খেয়াল রাখতে হবে যেন ইনফেকশান না হয়ে যায়।"

"আমরা বাইরে জুতো খুলে রেখে এসেছি খালাম্মা।"

"সেটাই ভালো।"

শাওন আর তার আম্মা রাজুর কাছে এগিয়ে গেলেন, শাওনের মা রাজুর মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে একটু আদর করে দিলেন—যেন সে পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা। রাজুর একটু লজ্জা লাগছিল, কিন্তু কিছু করার নেই। শাওনের আম্মা রাজুর সাথে একটা-দুটো কথা বলে খোঁজখবর নিয়ে রাজুর আম্মার সাথে কথা বলতে লাগলেন।

শাওন তার আম্মা সরে যাবার পর বুকের কাছে ধরে রাখা প্যাকেটটা বিছানায় রেখে রাজুর উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "কেমন আছ রাজু?"

"ভালো।"

"দেখি তোমার ব্যান্ডেজটা!"

রাজু ব্যান্ডেজটা দেখাল। ব্যান্ডেজ দেখে সে কী বোঝে কে জানে, কিন্তু তবু সে খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি না থাকলে আমি গিয়েছিলাম। এই গুলিটা তা হলে আমার মাথার মাঝে দিয়ে যেত।"

রাজু কিছু না বলে একটু হাসল। শাওন প্যাকেটটা খুলে ভিতরে থেকে কয়েকটা ডিটেকটিভ আর অ্যাডভেঞ্চার বই, দুটা ইংরেজি গানের ক্যাসেট আর একটা চকলেটের বাক্স বের করল। রাজু দেখে বলল, "সব আমার জন্য এনেছ?"

"হ্যাঁ, চকলেট অবিশ্যি আমিও কিছু খেতে পারি।"

"খাও।"

শাওন যখন খুব মনোযোগ দিয়ে চকলেটের বাক্স খুলছে ঠিক তখন হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে গেল এবং সাগর মাথা ঢুকিয়ে বলল, "ভাইয়া, বলো দেখি কে এসেছে?"

সাগরের উত্তেজনা দেখে অবিশ্যি বুঝতে বাকি রইল না মানুষটি কে হতে পারে, কিন্তু রাজু ইচ্ছে করে না-বোঝার ভান করল, জিজ্ঞেস করল, "কে?"

"আজগর মামা আর আগুনালি!"

"সত্যি?"

"সত্যি। এই দ্যাখো।" সে দরজা খুলে দিতেই আজগর মামা এবং তার পিছুপিছু আগুনালি এসে ঢুকল। আজগর মামাকে চেনা যাচ্ছে, কিন্তু আগুনালিকে চেনার কোনো উপায় নেই। তার চুল তেলে ভিজিয়ে পাট করে আঁচড়ানো, পরনে নূতন চকচকে শার্ট আর প্যান্ট, পায়ে কালো জুতো এবং মোজা। সাগর যদি বলে না দিত, রাজু তাকে হঠাৎ করে দেখে চিনতে পারত না।

আগুনালি সবাইকে দেখে একটু লজ্জা-লজ্জা পাচ্ছিল, কিন্তু তার মাঝেই দাঁত বের করে হেসে রাজুর কাছে এসে তার হাত ছুঁয়ে বলল, "রাজু, তুমি তো শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছ!"

রাজু কিছু না বলে আগুনালির দিকে তাকিয়ে হাসল। আগুনালি বলল, "তোমাকে দেখতে ম্যাচের কাঠির মতো লাগছে। শুকনো একটা শরীর—তার মাঝে বড় একটা মাথা! বেশি করে খাচ্ছ তো?"

"খাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, বেশি করে খাও।"

"খাব। তুমি ভালো আছ?"

"ভালো আছি।"

"তোমার আগুনের কাজকারবার কেমন চলছে?"

"ভালো।" আগুনালি হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, "নূতন একটা বোমা আবিষ্কার করেছি, তুমি যদি দেখ—"

আজগর মামা হঠাৎ তাদের গলা নামিয়ে কথা বলতে দেখে চিৎকার করে বললেন, "এদের আলাদা করে রাখো। এক্ষুনি আলাদা করে রাখো, নাহয় আবার কিছু-একটা কেলেঙ্কারি করে ফেলবে!"

মামার কথা শুনে সবাই হি হি করে হেসে উঠল আর আজগর মামা তখন আরও রেগে ওঠার ভান করে বললেন, "তোরা ভাবছিস আমি ঠাট্টা করছি? মোটেও ঠাট্টা করছি না। সত্যি কথা বলছি।"

মামা রাজুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "গুলি খেয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছিস বলে ভেবেছিস তোকে আমি ছেড়ে দেব? কক্ষনো না। নেভার। শাস্তি তোকে পেতেই হবে!"

"কিসের শাস্তি?"

"এখনও জানিস না কিসের শাস্তি? ঠিক আছে বলছি। আমার নূতন মোটর-সাইকেলটার একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিস! ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো! তোর নানার আমলের বন্দুকটা যত্ন করে রেখেছিলাম, সেটাকেও শেষ করেছিস। ব্যারেল বাঁকা, পিন ভাঙা! বন্দুকটা বের করার জন্যে আলমারিটা ভেঙেছিস। বাসার দরজা-জানালা খোলা রেখে পালিয়েছিস, চোর এসে বাসার সব জিনিস নিয়ে পালিয়েছে। যেসব নেয়নি বৃষ্টির পানিতে ভিজে চুপচুপে।"

সাগর হি হি করে হেসে বলল, "সব তোমার দোষ মামা!"

"আমার দোষ?"

"হ্যাঁ মামা। তুমি যদি না যেতে, তুমি যদি থেকে যেতে, তা হলে কিছু হত না। যদি চান মিয়াও আসত—"

মামা মাথা চুলকে বললেন, "হ্যাঁ, চান মিয়ার ব্যাপারটায় অবিশ্যি কারওই হাত নেই। আমি নিজে তাকে পাঠিয়েছি, কিন্তু আমি কেমন করে জানব ফেরিঘাটে সে ঝগড়া মারপিট করবে, আর পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে হাজতে ভরে রাখবে? সেটা আমি কেমন করে জানব?"

সাগর মাথা নেড়ে বলল, "সেটা আমি জানি না! সব দোষ তোমার মামা।"

শাওন বলল, "না মামা, আপনারা সবাই ভুল বলছেন। আসলে কারও কোনো দোষ নেই। আপনি যদি চলে না যেতেন তা হলে রাজুর সাথে আগুনালির দেখা হত না। আর আগুনালির সাথে যদি রাজুর দেখা না হত তা হলে আগুনালি তাকে ভূত দেখাতে নিয়ে যেত না। আর ভূতের জায়গায় যদি আমাকে না দেখত তা হলে এতদিনে আমি সত্যি সত্যি মরে ভূত হয়ে যেতাম।"

সাগর হি-হি করে হেসে বলল, "সত্যিকারের ভূত?"

"হ্যাঁ, সত্যিকারের ভূত।"

আজগর মামা নরম চোখে শাওনের দিকে তাকিয়ে তার পিঠে হাত রেখে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ মা। খোদা তোমাকে বাঁচানোর জন্যেই আমাকে গ্রামে পাঠিয়েছিলেন। গ্রামে গিয়ে আমি জুলটাকেও বাঁচিয়েছি। মোটর-সাইকেল বন্দুক আলমারি বাসার জিনিসপত্র সবকিছু নষ্ট হয়েছে খোদার ইচ্ছায়। আমি সবকিছু মেনে নিচ্ছি। কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই মানতে রাজি না। সেই অপরাধের শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে।"

"সেটা কোন অপরাধ মামা?"

"বিশাল একটা ডেকচিতে তোরা যে বিশ কে. জি. খিচুড়ি রেঁধে বাইরে ফেলে রাখলি, একবারও তোদের মনে হল না সেটা পচে গলে নষ্ট হয়ে পোকা হয়ে যেতে পারে?"

"তাই হয়েছে মামা?" সাগর চোখ বড় করে বলল, "তাই হয়েছে?"

"হ্যাঁ। মামা মাথা নাড়লেন, তাই হয়েছে। যেই মুহূর্তে রাজু ভালো হবে তখন সবাই মিলে আমার বাসায় গিয়ে আমার সেই ডেকচি তোদের পরিষ্কার করে দিতে হবে।"

রাজু খিকখিক করে হেসে বলল, "দেব মামা, দেব।"

"আর যখন আমার বাসায় যাবি, আমার মোটর-সাইকেল আর বন্দুক থেকে একশো হাত দূরে থাকিব। কমপক্ষে একশো হাত!"

"থাকব মামা।"

আজগর মামা হঠাৎ ঘুরে রাজুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তোরা যে হৈ চৈ করে মান্ধাতা আমলের একটা গাদাবন্দুক নিয়ে গেলি, একবারও কি ভেবেছিল যে বন্দুক ব্যবহার করতে গুলি লাগে?"

"গুলি?"

"হ্যাঁ, তোরা কি জানিস ওটাতে গুলি ছিল না? ঐ বন্দুকটা একটা লাঠি হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজে আসত না?"

শাওন খিলখিল করে হেসে বলল, "গুলি ছাড়াই ওটা চমৎকার কাজ করেছে, মামা। আমার বাবাকে ধরে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। পরের বার—"

মামা চোখ পাকিয়ে বললেন, "দাঁড়াও তোমাদের পরেরবার আমি বের করছি!"

মামার রাগ দেখে সবাই হি হি করে হাসতে থাকে, হাসতে হাসতে রাজুর বুকের ব্যান্ডেজটাতে হঠাৎ টনটন করে ওঠে—তবু সে হাসি থামাতে পারে না।

রাতে ডাক্তার রাজুর বুকের ব্যান্ডেজটা পালটে দিচ্ছিলেন। ভেতরের ঘা শুকিয়ে আসছে, খানিকক্ষণ লক্ষ করে কী-একটা ওষুধ দিয়ে নূতন করে ব্যান্ডেজ লাগাতে লাগাতে বললেন, "ইয়ংম্যান, তুমি খুব লাকি, তাই বেঁচে গিয়েছ। কিন্তু একটা দাগ থেকে যাবে সারা-জীবনের জন্যে। যখন বড় হবে, বিয়ে করবে—তোমার বউকে এই দাগটা নিয়ে কী বলবে এখন থেকে সেটা ঠিক করে রেখো!"

রাজু ডাক্তারের চোখের দিকে তাকাল, তারপর ফিসফিস করে বলল, "যদি এমন হয় যে সে আগে থেকে জানে?"

ডাক্তার রাজুর কথা ঠিক শুনতে পেলেন না, জিজ্ঞেস করলেন, "কী বললে ইয়ংম্যান?"

রাজু হঠাৎ টমেটোর মতো লাল হয়ে বলল, "না, কিছু না!"